খোলাপাতা

KHOLAPATA

ষান্মাসিক সৃজনশীল পত্রিকা

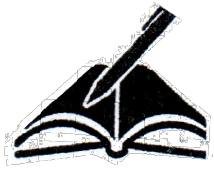

শারদীয় সংখ্যা

প্রকাশকাল

১৭ অক্টোবর, ২০২৩

প্রকাশক

রামনগর কলেজ শিক্ষক-সংসদ

গ্রন্থস্বত্ব

রামনগর কলেজ শিক্ষক-সংসদ

সম্পাদনা

সৈকত সরেন

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ড. অনন্তমোহন মিশ্র

মুদ্রণে

দাস অফ্‌সেট, রামনগর

সূচি

পৃষ্ঠা

- **ড. অনন্তমোহন মিশ্র** ২—৭
  (প্রসঙ্গ ঃ যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্মের উপদেশ)
- **Mr. Jagannath Patra**
  (Patents as Intellectual Property Rights : A Study in Context to India) ৮—১৩
- **ড. লিপিকা পণ্ডা** ১৪—১৬
  (ওদের হৃৎস্পন্দন)
- **ক্যাপ্টেন ড. নরনারায়ণ দাশ** ১৭—১৮
  (বিদ্যাধনং সর্বধনং প্রধানম্)
- **অধ্যাপক সুরেন কুমার মহাপাত্র** ১৯—২০
  (শালগ্রামের বৈশিষ্ট্য)
- **Dr. Achintya Kumar Samanta** ২১—২৪
  (SIR ASUTOSH MOOKERJEE : A MULTI-TALANT PERSONALITY AND AN ARCHITECT IN THE FIELD OF EDUCATION)
- **রমেশচন্দ্র মাইতি** ২৫—২৯
  (বাংলার সম্পদ কীর্তন)
- **Dr. Jyotirmoy Pandit** ৩০—৩২
  (The Story of Omayra Sanche's)
- **তপনকুমার রণজিৎ** ৩৩—৩৬
  (গ্রাম নামের আড়ালে ইতিহাসের খোঁজ)
- **বরুণ কুমার দাস** ৩৭—৪৪
  (স্মৃতির আঙিনায় বরেণ্য কবি জয়ন্ত)
- **Abhisek Jana[1] and Pijush Payra[2]** ৪৫—৪৯
  (SHRIMP CULTURE IN WEST BENGAL : PAST, PRESENT AND FUTURE)
- **Arup Kar & Sudip Mandal** ৪৯—৫৫
  ("STUDY THE EFFECT OF WATER PARAMETERS ON *SCYLIA SERRATA* GROWTH AT PURBA MEDINIPUR IN WEST BENGAL")
- **অসিত খাটুয়া** ৫৬—৫৯
  (CBCS)
- **ড. সন্তু সামন্ত** ৬০—৬১
  (আত্মনির্ভর ভারত ঃ একটি সমবায়িক দৃষ্টিভঙ্গি)
- **গোবিন্দ পাত্র** ৬২
  (ডিফেন্স স্টাডিজ বিভাগ, রামনগর কলেজ)
- **অধ্যাপক কানাই সাউ** ৬৩—৬৪
  (বাংলার সংগীত জগতের কিংবদন্তী শিল্পীদের গল্প গানে গানে)
- **Dr. Riyanka Maity** ৬৫—৬৬
  (EDIBLE SEAWEEDS)
- **প্রদীপ কুমার জানা** ৬৭
  (উঠোন)
- **গৌতম প্রামাণিক** ৬৭
  (শরৎ)

সম্পাদকীয়

প্রকৃতিতে চিরন্তনী অপরূপ শারদ। বর্ষণ বিধৌত মেঘমুক্ত আকাশের সুনীল রূপকান্তি। আলো-ছায়ার ছুটোছুটি। সবুজে সবুজ পৃথিবী। শিউলির সুগন্ধ, শিশিরের আলিম্পন, শাপ্‌লা শালুকের সলাজ ঢলাঢলি। আবার কি নির্মম পরিহাস! প্রকৃতির রোষ, বিশ্বজুড়ে রণহুংকার মনুষ্য ঔদ্ধত্যের নিশান, বিশ্বক্রিড়ায় মিলনের বিজয় কেতন। এর মাঝে মায়ের আগমন। সব মিলে মন কেমনের ভাবৈশ্বর্যের দুয়ার গেল খুলে। ভাব-বিষয়-তথ্য আর তত্ত্ব—সবেতেই মানুষের সমানাধিকার। ভিন্ন ভিন্ন লেখকের ভাবের মননশীলতা ও পরিবেশন নৈপুণ্যে তথা বিষয়বৈচিত্র্যে এবারের খোলাপাতার শারদ সংখ্যা অভিনব। বোদ্ধা পাঠকমাত্রেই তা উপলব্ধি করতে পারবেন বলে মনে করি।

প্রত্যেক লেখক/লেখিকা সহ পত্রিকা প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই শারদ শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। উৎসবের দিনগুলি সকলের কাছে আনন্দময় হয়ে উঠুক।

প্রসঙ্গ ঃ যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্মের উপদেশ

ড. অনন্তমোহন মিশ্র
(অধ্যক্ষ, রামনগর কলেজ, দেপাল, পূর্ব মেদিনীপুর)

● শত্রু মোকাবিলায় সন্ধি কিংবা যুদ্ধ নিরুপনে ইঁদুর-বিড়ালের গল্প ●

রাজা কিংবা সাধারণ মানুষের শক্তি বা ক্ষমতার ভারসাম্য সব সময় একরকম হয় না। ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকেই যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেন, ''যদি কোনো রাজা শক্তিশালী এক বা একাধিক নৃপতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন, তখন তাঁর কি করা উচিত? যুদ্ধ না সন্ধি? যদি এমন পরিস্থিতি হয় যখন মিত্রগণ ও শত্রুর ন্যায় আচরণ করছে; তখন সেই রাজার করণীয় কি?''

ভীষ্ম এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে। একটি গল্পের সাহায্য নিয়ে। তার আগে তিনি বলেন যে, ''অভিজ্ঞতা থকে দেখা যায়, শত্রু-মিত্র সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি সতত পরিবর্তনশীল। কোনো ছকে বাঁধা নিয়মে নির্ধারিত হয় না। বাস্তবে শত্রু কখনো কখনো মিত্র হয়। আবার মিত্রও অনেক সময় সবাইকে অবাক করে দিয়ে শত্রু-রূপে অসি ধারণ করে এগিয়ে আসে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় গভীর বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে, দেশ-কাল-পাত্র ইত্যাদি সকল পরিবর্তনশীল বিষয় বা পরিস্থিতিগুলিকে সামনে রেখে।

বাস্তবে যে কোনো শুভাকাঙ্খী পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে সন্ধি করতে কোনো বাধা নেই। আবার প্রাণরক্ষার মতো আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কোনো শত্রুর সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হলে দোষের হয় না। তাই বলে কোনো মূর্খ প্রতিপক্ষের সঙ্গে সন্ধি 'নৈব নৈব চ'।'

এরপর তিনি যুধিষ্ঠিরকে শোনালেন ইঁদুর-বিড়ালের প্রাচীন একটি গল্প। গল্পটি অত্যন্ত উচ্চমানের। রাজনীতি, সমাজনীতি এবং মূল্যবোধের বহু মূল্যবান উপদেশ-সমৃদ্ধ সেই আলোচনাটি এখন পরিবেশিত হলো।

ইঁদুর-বিড়ালের গল্প

কোনো একটি অরণ্যে একটি সুবিশাল প্রাচীন বটবৃক্ষ ছিল। গাছটি অসংখ্য শাখা-প্রশাখাযুক্ত। ছোট-বড় অগণিত পক্ষিকূলের আশ্রয়স্থল ছিল সেই বৃক্ষটি। তার শিকড়গুলি ছিল সুবিস্তৃত। এবং তার সুশীতল ছায়ায় বহু জীবজন্তু ও অন্যান্য প্রাণীকূল বাস করতো। সেই গাছটির শিকড়ের একটি গর্তে পালিত নামে একটি ইঁদুর বাস করতো। আবার ঐ গাছটির উপর বাস করত লোমশ নামে একটি বিড়ালও। গাছটিকে কেন্দ্র করে বসবাস করা নানারকম পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতো সেই বিড়ালটি। এইভাবে মহানন্দে কেটে যাচ্ছিল তার দিনগুলি।

একদিন সেই বনে এক চণ্ডাল এসে বসবাস করতে শুরু করলো। প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় দড়ির জাল দিয়ে তৈরি ফাঁদ অরণ্যে পেতে দিত সেই চণ্ডালটি। তারপর তার আস্তানায় এসে ঘুমোতো। রাতে সেই ফাঁদের উপর দিয়ে যে সব জন্তু-জানোয়ার যাতায়াত করতো, তারা ধরা পড়তো সেই জালে। এবং সকাল হলে চণ্ডাল এসে অতি সহজে তাদের ধরে ফেলতো।

এমনিতে লোমশ-বিড়াল বেশ সাবধান-সতর্ক হয়ে থাকতো। তা সত্ত্বেও সে একদিন চণ্ডালের পাতা জালে ভুল করে আটকে পড়লো।

চিরশত্রু লোমশকে ঐভাবে জালে আটকে পড়তে দেখে পালিত-ইঁদুর সাহস করে বেরিয়ে পড়লো খাবারের খোঁজে। সামান্য ঘোরাঘুরির পর তার চোখে পড়লো চণ্ডালের পাতা সেই জালটি, যেখানে জন্তুদের প্রলোভিত করার জন্য যত্রতত্র ছড়িয়ে রাখা ছিল টুকরো-টুকরো অনেকগুলি মাংসপিণ্ড। তখন আর কালবিলম্ব না করে পালিত-ইঁদুর ছোট ছোট পায়ে তর তর করে উঠে পড়লো পাতা জালটির উপর; মাংস-টুকরোগুলি খাওয়ার লোভে। এবং খুব

সহজেই মাংস টুকরোগুলি পেয়ে খেতে লাগলো মনের আনন্দে। সেইসঙ্গে জালে আটকে থাকা চিরশত্রু লোমশ-বিড়ালটির দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে তার মনে তখন দারুণ উল্লাস।

অবশ্য এই আনন্দ তার মনে খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। হঠাৎ তার নজরে পড়লো হরিণ নামে সেই বেজিটিকে, যে আশেপাশের একটি গর্তে বাস করতো। ইঁদুরের গন্ধ পেয়ে গর্ত ছেড়ে জিভ লকলক করতে করতে সে এগিয়ে আসতে লাগলো। অন্যদিকে ইঁদুরটি আরও দেখতে পেল চন্দ্রক নামে তার আর এক শত্রু একটি পেঁচাকে। সেটি বাস করতো বটগাছটিতে। এইভাবে সামনে হাজির সাক্ষাৎ শমণ-রূপ বেজি এবং গাছের ডালে ওৎপেতে থাকা পেঁচাটিকে দেখে ইঁদুরের মাংস খাওয়ার আনন্দ মুহূর্তে মাটি হয়ে গেল। তার তখন নিজের প্রাণ বাঁচানোই দায়!

কিন্তু শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করে তো পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায় না। কোনো প্রাণী যদি নিশ্চিত বিনাশের মুখে এসে দাঁড়ায়, তখন তাকে খুঁজে নিতে হয় পরিত্রাণের রাস্তা। নিজের উদ্যোগে। যে কোনোভাবে, যে কোনো মূল্যে।

পালিত-ইঁদুর সব দিক বিবেচনা করে দেখল যে, এখন যদি সে জাল থেকে নিচে নেমে আসে তাহলে তাকে বেজি মুখে ভরে নেবে। আবার জালের উপর থেকে গেলে গাছের ডালে বসা পেঁচাটি খপাৎ করে ঠোঁটে ঝুলিয়ে তাকে তুলে নিয়ে চলে যাবে। আবার জাল কেটে ভিতরে ঢুকলে জালের ভিতরে থাকা মহাশত্রু বিড়াল তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া, এক কথায় অসম্ভব।

তবে পরিস্থিতি যতই সঙ্গীন হোক, ভয় পেলে তার চলবে না। শেষ পর্যন্ত তাকে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

ইঁদুর তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভাবতে লাগলো। বিড়াল তার মহাশত্রু—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই বিড়াল এখন চরম-সঙ্কটে। তাকে যদি তার প্রাণরক্ষার প্রস্তাব দেওয়া হয়, সম্ভবত সে সেই প্রস্তাব উপেক্ষা করতে পারবে না। এই ঘোর বিপদে সে তার যত বড় শত্রুই হোক না কেন, তাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিলে বিনিময়ে সেও তার প্রাণ বাঁচাতে যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

পণ্ডিতদের মত হলো বিপদের সময় জীবন রক্ষার প্রয়োজনে বলবান ব্যক্তি এমনকি, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শত্রুর সঙ্গেও সমঝোতা করা উচিত। ঐ সময় শত্রুর বিদ্যা-বুদ্ধি বিবেচনা করা উচিত নয়। তার সাহায্যই মূখ্য এবং একমাত্র বিবেচ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়। তাই চিরশত্রু বিড়াল এই পরিস্থিতিতে অবশ্যই প্রাণ বাঁচাতে ইঁদুরকে সাহায্য করবে। কারণ, উভয়েই তখন প্রাণ-সংকটে ভুগছে। উভয়ে উভয়কে সাহায্য করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ তাদের সামনে খোলা নেই।

এভাবে সব দিক ভেবে ইঁদুর বিড়ালকে ডেকে বলল—"ভাই বিড়াল! তুমি ঠিক আছো তো? অনেকক্ষণ জালে আটকে থেকে কষ্ট হচ্ছে না তো? জানি, আমি তোমার শত্রু। তবুও তোমার প্রাণ রক্ষার জন্য আমি কি তোমাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি? এখন আমাদের দু'জনের প্রাণই গভীর সঙ্কটে। তুমি আমাকে কথা দাও যে, তুমি আমার কোনোরকম ক্ষতি করবে না। তাহলে আমিও তোমাকে কথা দিচ্ছি যে, চণ্ডালের পাতা এই জালের ফাঁস কেটে পালানোর জন্য আমি তোমাকে সব রকম সাহায্য করবো।

অনেক ভেবেচিন্তে আমি তোমাকে এই প্রস্তাব দিচ্ছি। এর ফলে আমাদের দু'জনেরই মঙ্গল হবে।

ঐ দেখো গাছের ডালে বসে পেঁচা এবং সামান্য দূরে বসে বেজিটি আমাকে বিনাশ করবে বলে কিভাবে ওৎ পেতে বসে আছে। পেঁচার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে। তুমি একথা নিশ্চয়ই জানো যে, সৎ ব্যক্তিরা সাত-পা এক সঙ্গে চললে পরস্পর বন্ধু হয়ে যায়। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণও। তাই এই চরম বিপদের সময় এসো আমরা পরস্পর মিত্র হয়ে যাই। আমার সাহায্য ছাড়া তুমি এই জাল কেটে কিছুতেই বেরোতে পারবে না। তুমি যদি আমাকে অভয় দাও তাহলে আমি তোমার নীচে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাই। বিনিময়ে সঠিক সময়ে জালের ফাঁস কেটে আমিও তোমাকে প্রাণে বাঁচাব চণ্ডালের হাত থেকে।

তাই আমার ইচ্ছা আমরা দু'জন এখন মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হই। এবং পরস্পর এই ঘোর বিপদে সাহায্য দেওয়া-নেওয়া করে আমাদের অমূল্য প্রাণ বাঁচাই।"

পালিত-ইঁদুরের দেওয়া আকস্মিক এই সন্ধি প্রস্তাব লোমশ-বিড়ালকে সব কিছু পুনর্বিবেচনা করতে উৎসাহিত

করলো। সে ইঁদুরকে উদ্দেশ্য করে বলল—''সৌম্য! তুমি আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্য যে প্রস্তাব করলে তা অবশ্যই আনন্দের। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমরা উভয়ে এখন এক কঠিন বিপদের মুখে পড়েছি। শাস্ত্রে বলে বিপদগ্রস্ত দু'জনের মধ্যে যে কোনো সময় সন্ধি হতে পারে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, তোমার প্রতি আমার একটা উন্নাসিক মনোভাব আছে। কিন্তু এখন এই ঘোর সঙ্কটে পরিত্রাণ-স্বরূপ তুমি যে প্রস্তাব আমাকে দিয়েছো তাতে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা-বিশ্বাস জাগরিত হচ্ছে। এখন মনে প্রাণে সত্যি আমি তোমার শরণাগত। তুমি যা বলবে, আমি সেই অনুসারে তোমার অনুগামী হব।''

লোমশ-বিড়ালের কথা শুনে পালিত-ইঁদুর বুকে বল পেল। সে বলল—''আমার এখন বেজিকে দেখে বড্ড ভয় করছে। আমি তোমার নীচে গিয়ে লুকোচ্ছি। তুমি আমাকে প্রাণে মেরো না। রক্ষা করো। ওদিকে ঐ পেঁচাটিও আমার দিকে কেমন লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তুমি এই দু'জনের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। আমি কথা দিচ্ছি। এর প্রতিদান তুমি যথা সময়ে পাবে।''

এভাবে দুই জন্মশত্রু শুধুমাত্র পরিস্থিতির কারণে অপাত-মৈত্রীর এই বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হলো। লোমশ-বিড়াল পালিত-ইঁদুরকে স্বাগত জানিয়ে বলল—''বন্ধু! এসো, তুমি আমার শরীরের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করো। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যতক্ষণ দেহে শক্তি আছে, ততক্ষণ তোমাকে প্রাণ দিয়ে তোমাকে রক্ষা করবো। এই ঘোর সঙ্কটে আমরা পরস্পরের অবলম্বন হয়ে নিজেদের রক্ষা করতে চাই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা এই যে, আমরা যেন এই মৈত্রী ভবিষ্যতেও ধরে রাখতে পারি। নিজেদের মঙ্গলের জন্য যেন একাত্ম হয়ে থাকতে পারি।''

বিড়ালের দেওয়া আশ্বাস বাক্য শুনে ইঁদুরের উৎসাহ কয়েক গুণ বেড়ে গেল। সে ভাবল যে, আপাতত প্রাথমিক ধাক্কাটুকু সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তখন সে অনেকটা উৎফুল্ল হয়ে বলল—'বন্ধু! এই বিপদ থেকে রক্ষা পেলে আমিও তোমাকে কথা দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে তোমার প্রীতি সম্পাদনে আমি সাধ্যমত সকল কাজ করবো। আমি জানি, যে কোনো উপকারের ঋণ অন্য কোনো উপকার দিয়ে শোধ করা যায় না। কারণ, প্রথম জন কোনো কিছু না পেয়ে উপকার করে, কিন্তু দ্বিতীয় জন উপকারের বিনিময়ে কিছু প্রতিদান দিয়ে সেই ঋণ শোধের চেষ্টা করে।

এইভাবে বিড়ালকে তার স্বার্থের বিষয়টি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়ে ইঁদুর তার নিরাপত্তার দিকটি সংশয়-মুক্ত করলো। তারপর অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে বিড়ালের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করলো। অন্যদিকে বিড়াল ইঁদুরকে প্রত্যাশার অতিরিক্ত যত্ন দিয়ে তাকে নিজের কোলে রেখে তার প্রাণ রক্ষা করতে লাগলো। আর এই অভাবনীয় দৃশ্য দূর থেকে দেখে পেঁচা ও বেজি যে অত্যন্ত হতাশ হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। তখন তারা বিষণ্ণ বদনে নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেল।

এদিকে ইঁদুর সাময়িকভাবে একটু স্বস্তি অনুভব করলেও তার ভাবনায় এরপর উঠে এ'ল চণ্ডালের বিষয়টি। আকৃতিতে সে বেশ ছোট, একথা ঠিক, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে তার ধারণা সুস্পষ্ট। তাই আর সময় নষ্ট না করে সে একটু একটু করে জালের দড়ি কাটতে লাগলো। তবে তার গতি বেশ ধীর। তা দেখে বিড়াল বাধ্য হয়ে ইঁদুরকে বললো—''তুমি জাল কাটার কাজটি অকারণে বিলম্বিত করছো কেন? তুমি কি জানো না মৃত্যু-রূপী চণ্ডাল যে কোনো সময় চলে আসবে। আর তার আসার আগে আমাকে মুক্ত হতে হবে।''

আকৃতিতে সে যত সামান্যই হোক না কেন, ইঁদুর প্রকৃতই বুদ্ধিমান। সে জানে, বিড়াল যদি আগে-ভাগে ফাঁদমুক্ত হয়ে যায় তাহলে সে তার সম্ভাব-ধর্ম রক্ষা করবে। এবং বন্ধুত্ব ভুলে ইঁদুরকে উদরস্থ করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। তাই বিড়ালের আগাম-মুক্তি বিড়ালের কাছে বহু-আকঙ্খিত হলেও ইঁদুরের পক্ষে সে শুভ নয়। সে তখন বলল—''ভয় পেয়ো না বন্ধু! আমি তো আছি। আমি সঠিক সময়ে তোমাকে ফাঁদ-মুক্ত করবো। তুমি নিশ্চিত জানবে যে, একাজে আমার কোনো ভুল হবে না।

বন্ধু, কাজ করতে হয় সময় বুঝে। অসময়ে কাজ করলে সেই কাজের ফল সব সময় মধুর নাও হতে পারে। তুমি একটু ধৈর্য ধরো। চণ্ডাল আসছে দেখলেই আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে বিপন্মুক্ত করব। তুমি তখন নিঃশঙ্ক চিত্তে

গাছে উঠে প্রাণ রক্ষা করবে। তখন চণ্ডালের হতাশ বদন দেখে অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করবে। আমিও সেই মুহূর্তে নির্ভয়ে গর্তে প্রবেশ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো। আমার মুমূর্ষু প্রাণ রক্ষা করবো।

ইঁদুরের আশ্বাস-বাক্য বিড়ালকে খুব বেশি স্বস্তি দিতে পারে নি। অনেকটা অনুযোগের সুরে সে তখন বলল—প্রিয়! সজ্জন ব্যক্তি বন্ধুকে রক্ষা করে প্রীতির সঙ্গে। তোমার মতো অবহেলা বা বিলম্বিত-লয়ে নয়। আমি প্রতিশ্রুতি মতো প্রীতির সঙ্গে তোমার প্রীতির কাজটি করে দিয়েছি। তুমি কেন আমার প্রীতি-বর্ধনে তৎপর হচ্ছো না। তোমার কাছে আমার একটাই অনুরোধ, এমন কাজ করো যাতে আমাদের উভয়ের প্রীতিবর্ধন হয়। সত্যিকারের মঙ্গল হয়।''

ইঁদুর শুধুই যে বুদ্ধিমান তাই নয়, নীতিজ্ঞও বটে। সে বিড়ালকে সাহসের সঙ্গে বলল—''যে মিত্রের থেকে ভয়ের সম্ভাবনা থাকে তার সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করা উচিত। বিষধর সাপ নিয়ে সাপুড়ে যখন খেলা দেখায় তখন সে সাপের ছোবল বাঁচিয়েই কাজটি করে। যে ব্যক্তি বলবানের সঙ্গে সন্ধি করে নিজের দুর্বল অবস্থানটির কথা ভুলে যায়, তার সেই মৈত্রী অনেক সময় কুখাদ্য গ্রহণের মত অহিতকর হয়ে ওঠে।

বন্ধু, আমি জানি, চণ্ডাল এলে তোমার তখন পালানোর ইচ্ছাটি প্রবল হবে। আর আমাকে ধরার বাসনাটি মন থেকে মুছে যাবে। তখনই আমি তোমাকে এই জাল থেকে মুক্ত করবো। আমি ইতিমধ্যে এই জালটির সকল বাঁধন কেটে দিয়েছি। শুধুমাত্র একটি বাঁধন বাকি আছে। সেটি আমি সঠিক সময়ে ছিন্ন করবো। তুমি এই বিশ্বাস আমার প্রতি রাখতে পারো। আমি তোমাকে ঠকাবো না।''

এইভাবে দু-তরফের কথায় কথায় গোটা রাতটি কেটে গেল। লোমশ-বিড়াল একরাশ উদ্বেগ ও আশঙ্কা নিয়ে তখনো জালে বন্দি আছে। সূর্যোদয়ের মাহেন্দ্রক্ষণে পরিখ-চণ্ডাল এইদিকে ধেয়ে আসবে। তার সেই ভয়ংকর সাক্ষাৎ যমদূতের মূর্তিটি কল্পনা করতে করতে বিড়ালের গলা শুকিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে ইঁদুর দূর থেকে দেখতে পেলো চণ্ডাল হাতে একটা মস্ত লাঠি নিয়ে এগিয়ে আসছে। সে ভাবলো এই হলো সেই সময় যখন সে জালের দড়ির শেষে বন্ধনটি ছিন্ন করে বিড়ালকে মুক্ত করবে। এবং নিজেও মুক্ত হবে। তাই আর দেরি না করে সে বিড়ালকে বললো, বন্ধু, শেষ বাঁধনটি কেটে দিলাম। তুমি দৌড়ে পালাও। গাছে উঠে প্রাণ রক্ষা করো।

সঙ্গে সঙ্গে বিড়াল বাঁধন-মুক্ত হলো। এবং এক লাফে বটগাছের ডালে উঠে প্রাণ-রক্ষা করলো। অন্যদিকে ইঁদুরও তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে দ্রুত পদে স্থান ত্যাগ করলো। পরমুহূর্তে গর্তে প্রবেশ করে করলো আত্মরক্ষা।

বলা বাহুল্য, পরিখ-চণ্ডাল এসে পাতা জালটি উল্টে পাল্টে দেখল যে, জালটি শিকার-শূন্য তাই নয়, বরং জালটির বহু স্থানের বাঁধন ছিন্ন। যা দেখে সে বিস্মিত হলো। এবং তার কারণ অনুমান করতে করতে বিরস বদনে সে কুটিরের পথে রওনা দিলো।

গাছের ডালে বসে পারিখ-চণ্ডালের কাণ্ড-কারখানা দেখে বিড়াল বেশ আনন্দ পেলো। চণ্ডালের ঘর ফেরার দৃশটি দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করলে নিজেকে সামলে নিয়ে সে এবার ইঁদুরের কথা ভাবতে লাগলো।

ডালে বসে ইঁদুরকে উদ্দেশ করে বললো—''বন্ধু! কোনো কথাবার্তা না বলে একেবারে গর্তের ভিতর ঢুকে পড়লে যে? আমি তোমাকে বিপন্মুক্ত করেছি। বিনিময়ে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো। একটু আগেই আমরা মৈত্রীর অঙ্গীকার করেছি। তারপরও তোমার মধ্যে আমাকে নিয়ে এত ভয়? তুমি গর্ত থেকে বেরিয়ে এসো। চলো, এবার আমরা আমাদের বন্ধুত্ব উপভোগ করি।

আমি তোমার মতো বুদ্ধিমান, নীতিজ্ঞানী প্রিয় বন্ধুকে উপযুক্ত সম্মান দিতে চাই। তোমার মত ব্যক্তির যথাযোগ্য মর্যাদা পাওয়া উচিত। আমি চাই তুমি আজীবন আমার পাশে থাক। আমার শুভাকাঙ্খী পরামর্শদাতা-মন্ত্রী হয়ে আমাকে সদুপদেশ দাও। তোমার বুদ্ধি শুক্রাচার্যের থেকে কম কিছু নয়। আমার পরামর্শদাতা হয়ে আমাকে তোমার গুণগ্রাহী করে নাও।''

বিড়ালের এমন প্রীতিবাক্য ইঁদুরকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি। বরং দীর্ঘ স্তুতিবাক্যের প্রত্যুত্তরে সে বললো—''বন্ধু! বন্ধুর মৈত্রী কোনো স্থায়ী বিষয় নয়। আবার শত্রুতাও এমন কোনো বিষয় নয় যে, তা চিরকালব্যাপী

সক্রিয় থাকবে। বাস্তবে মৈত্রী ততদিন সক্রিয় বা মজবুত থাকে, যতদিন উভয়ের মধ্যে স্বার্থ-বিরোধ না আসে। স্বার্থ-রক্ষাই মৈত্রী বা শত্রুতার মূল কথা। স্বার্থ যখন অরক্ষিত হয়, অর্থাৎ স্বার্থ সংঘাতই শত্রুকে মিত্র, কিংবা, মিত্রকে শত্রু বানায়। এটি কোনো স্থির বিষয় নয়। নিরন্তর পরিবর্তনশীল একটি সম্পর্ক।

যে ব্যক্তি সব সময় মিত্রকে বিশ্বাস করে চলে, কিংবা শত্রুর সঙ্গে বৈরীতা চালিয়ে যেতে থাকে, সময়, পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়মিতভাবে পূনর্মূল্যায়ন করে না, তার বিনাশ যে কোনো সময় ঘটতে পারে।

বন্ধু, রক্তের সম্পর্ক কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন—সেগুলিও স্বার্থ-কেন্দ্রিক। নিজের একমাত্র পুত্র সেও যদি পিতা-মাতার স্বার্থের বিপরীতমুখী আচরণ করে, তাকেও বিশ্বাস করা উচিত নয়। তেমন হলে তাকে ত্যাগ করাই উচিত। জগতের সকল জীব কম-বেশি সকলেই স্বার্থের উপাসক। আমাদের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা একটি বিশেষ কারণকে মান্যতা দিয়ে। আমাদের উভয়ের প্রাণ-রক্ষার প্রয়োজনেই আমরা মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম।

শত্রু-মিত্র বিচারবোধ মেঘের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়। তোমার এবং আমার মধ্যে যে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তার উদ্দেশ্য-পূরণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে। আমাদের উভয়ের প্রয়োজনে সেই সম্পর্ক তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে।এখন তুমি আমার খাদক। আমি তোমার খাদ্য। আমি নিতান্তই সাধারণ একটি জীব, দুর্বল। তুমি অবশ্যই বলবান এবং পরাক্রমী। আমাদের উভয়ের শক্তি ও সামর্থ ভিন্ন-ভিন্ন। খাদ্যাভাস ও জীবনযাত্রার ধরণ ভিন্ন-ভিন্ন। তাই বিনা প্রয়োজনে আমাদের এই সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়া নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়।

আমি স্থির নিশ্চিত যে, তুমি এখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। এখন তোমার দরকার খাদ্য-গ্রহণ। এটি ভাবলে কি খুব ভুল হবে যে, তুমি আমাকে খাদ্য হিসাবে পেতে চাও। তোমার সঙ্গে এখন তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলে রয়েছে। আমি তোমার সামনে গিয়ে তোমার সঙ্গে কুশল বিনিময় করতেই পারি। কিন্তু হাতের কাছে এমন সুখাদ্য পেয়ে তোমার পরিবারের লোকজন কি আমাকে ছেড়ে দেবে? তখন তারা যদি আমাকে খেয়েই ফেলে তাতে দোষের কিছু নেই। তাই তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে আমি আমি তোমার সামনে হাজির হতে পারি না। আমাদের মিলনের উপলক্ষ ও কারণ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। পুনর্মিলনের এই আহ্বান আমার দিক থেকে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ক্ষুধার্ত, আহার-সন্ধানী খাদকের সামনে খাদ্যের ধরা দেওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তোমাকে ভীষণ ভয় পাই। তাই তোমার ডাকে সাড়া দেবো, তোমার সামনে হাজির হবো—এমন আকাশকুসুম প্রত্যাশা কোরো না। আমার উপকার সত্যি তোমার মনে যদি কোনো প্রীতি সঞ্চার করে থাকে, তা মনের এক কোণে ধরে রেখো। ভবিষ্যতে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি তোমার কখনো সামনে হই, তাহলে প্রীতির-স্মারক মনে করে আমাকে আক্রমণ করে বসো না। আমি তোমার জন্য সব কিছু করতে পারি, তাই বলে প্রাণের বিনিময়ে নয়। শাস্ত্রে বলে নিজেকে রক্ষা করার জন্য রাজ্য, ধন, সম্পদ এমনকি নিজের প্রতিরূপ সন্তানকেও ত্যাগ করা সম্ভব। কারণ হৃত-সম্পদ, হৃত-গৌরব—সব কিছুই পুনরুদ্ধারযোগ্য। কিন্তু প্রাণ হারালে তা ফিরে পাওয়া যায় না। তা পুনরুদ্ধারযোগ্য নয়।''

পালিত-ইঁদুরের এমন নীতিজ্ঞান-সমৃদ্ধ স্পস্ট বাক্যগুলি লোমশ-বিড়ালকে বেশ লজ্জায় ফেলে দেয়। আপাতভাবে কোণঠাসা হলেও নিজের অবস্থানের স্বপক্ষে যুক্তি সাজিয়ে সে প্রত্যুত্তরে বললো—''ভাই। তোমার কথাগুলি শুনতে যতই কর্কশ হোক, যুক্তিতে অকাট্য। তবে বিশ্বাস করো, বা না করো, আমি তোমাকে অন্তর থেকে ভালবাসি। তোমার কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। তুমি ঐ সময় আমার পাশে এসে না দাঁড়ালে চণ্ডালের হাত থেকে কিছুতেই রেহাই পেতাম না। তুমি যথার্থই আমার প্রাণদাতা। তুমি ধর্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞান-সম্পন্ন।

তোমার আচরণ ও যুক্তিপূর্ণ বাক্য বিন্যাস আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি তোমার গুণগ্রাহী। তোমার জন্য আমি আমার সকল বন্ধু-বান্ধব পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারি। এমন কি, আমি আমার প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হব না। তোমার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সমাজের সম্পদ। তাদের প্রতি যে কেউ বিশ্বাস ধরে রাখতে পারে। তাই আমার দিক থেকে ভবিষ্যতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। এই আশ্বাস আমি তোমাকে দিলাম।''

বিড়ালের আশ্বাস বাক্য শুনে ইঁদুর অনেকখানি বিগলিত হলো। বলল—''তুমি প্রকৃতই সজ্জন। উপকারী বন্ধু।

তোমার কথা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তবুও আমি তোমাকে চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস করতে পারি না। এই প্রসঙ্গে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের দুটি উপদেশ আমাকে বিশেষভাবে সাবধানী হতে শিখিয়েছে। সেগুলি হলো—এক, যখন দুই শত্রুর মধ্যে যদি একই রকম বিপদ উপস্থিত হয়, তখন দুর্বল, সবল ভেদাভেদ ভুলে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিপদ সরে গেলে দুর্বল বন্ধুটির উচিত সবল বন্ধুটির সঙ্গ ত্যাগ করা।

দুই, অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে কখনোই বিশ্বাস করা উচিত নয়। আবার বিশ্বাসী ব্যক্তিকে খুব বেশি বিশ্বাস করা উচিত নয়। বুদ্ধিমান হলো সে যে নিজের প্রতি অন্য সকলের বিশ্বাস তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু নিজে নিঃশর্তভাবে কখনো কাউকে বিশ্বাস করে না।

তাই নীতিশাস্ত্রের সার কথাগুলি হলো যে, কখনোই কোনো অবস্থাতে কাউকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয়। এই যুক্তিতে শত্রুকে কখনোই নিঃশর্তভাবে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। তাই লোমশ ভাই, তোমার কাছ থেকে আমাকে সব সময় নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখা উচিত। এবং একই যুক্তিতে তুমিও নিজেকে চিরশত্রু চণ্ডালের থেকে শত-যোজন দূরে সরিয়ে রাখবে।''

ইঁদুর চণ্ডালের নামটি উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে বিড়াল ভীষণ ভয় পেল। তাই আর কথা না বাড়িয়ে লাফ দিয়ে সে দূরে অন্য স্থানে চলে গেল।

ভীষ্মের পরামর্শ

ভীষ্ম গল্পটি শুনিয়ে সব শেষে বললেন—যুধিষ্ঠির! এইভাবে খর্বাকার দুর্বল পালিত-ইঁদুর শুধুমাত্র নিজের বুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রয়োগ করে সেই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিল করতে সক্ষম হয়েছিল। সাফল্যের সঙ্গে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। এই ঘটনা থেকে শিক্ষনীয় যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংকটকালে শত্রুর সঙ্গে অবশ্যই করমর্দন করবেন। তাই বলে সঙ্কট সমাধানে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে কখনোই বসে থাকবে না। সঙ্কট সমাধানে নিজের বুদ্ধি, উদ্যোগ, প্রচেষ্টা সহ সকল সুযোগ-সুবিধার সর্বোত্তম প্রয়োগ ঘটিয়ে সঙ্কট থেকে মুক্তিলাভ করবেন। এবং সঙ্কটমুক্ত হলে আপৎকালীন মৈত্রী ছিন্ন করে শত্রুর থেকে নিজেকে সুরক্ষিত করবেন।''

একইভাবে সন্ধি কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহ বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় একজন নৃপতির ঠিক এইভাবেই নিজের সুরক্ষা করা স্থির করবেন। তবে সব দিক থেকে নাশকতার সকল সম্ভাবনাগুলিকে উপেক্ষা না করে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে পথ চলবেন। জীবনের ক্ষেত্রে যেমন, প্রশাসনের ক্ষেত্রেও শত্রু কিংবা বন্ধু বিষয়ক সকল সিদ্ধান্তগুলি আপৎকালীন, উদ্দেশ্যমুখী (Adhoc)। এগুলি নিরন্তর পুনর্মূল্যায়ন করতে হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী সবকিছু বার বার ঢেলে সাজাতে হয়।

আলোচ্য গল্পটি এক কথায় রাজনীতির ক্ষেত্রেই শুধু নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের পথ চলার সিদ্ধান্তগুলিকে সঠিকভাবে স্থির করতে অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশ দান করে। এই উপদেশ চিরকালীন। সময় বদলালেও উপদেশগুলির সারার্থ সজীব এবং সমানভাবে কার্যকরী। এই বিশ্বাস নিয়ে জীবনের পথে রাখা যায়।

——ঃঃ——

Patents as Intellectual Property Rights : A Study in Context to India

Mr. Jagannath Patra

(Associate Professor of Commerce, Ramnagar College, Depal, Purba Medinipur)

Introduction :

Intellectual Property Right (IPR) in an inevitable tool for today's globalised world because mere possession of land, labour and capital are not enough for any country to succeed: the knowledge dimension has taken a very important place in this phenomenon. In other words, there has been a transition of the concept of economy from 'resource-based to knowledge-based'. As a result, in future the wealth would more and more come out of our brains and less and less will it come out of the ground. And the goods and services being created by our brainpower would be marketed in the global village. Now a basic issue to be addressed is that how can this property of knowledge be protected? Since knowledge is abstract and is not like a car or a house which can be locked and secured against theft, there are two ways of turning knowledge into property. One way is secrecy, which is used to protect three types of information, namely trade secrets, know-how and rituals. Another way is intellectual property laws, including Copyright, Patent, registered industrial Design and Trademark, legislation and conventions.

India is well recongnized for its intellectual skills in the fields of software engineering, missile technology, space mission and other technological areas. In spite of that, India lags in generation of Intellectual Property Right (IPR) assets. In a recent report by the US Chamber of Commerce, India stood at the 29th position amongst 30 countries in IP index around the globe.

The term 'Intellectual property' is related to human brain applied for creativity and invention. Intellectual Property Rights (IPR) is territorial rights by which an owner can sell, buy or license his intellectual property similar to physical property. On the basis of type of invention and creation of human mind and their applications, the intellectual property rights are classified as follows : i) patents, ii) trademarks, iii) industrial designs, iv) layout design of semiconductor integrated circuilt, v) geographic indications of source, vi) copyright and related rights (literary and artistic works, musical works, artistic works, photographic work, motion pictures, computer programmes and performing arts and broadcasting work).

In this paper as effort is made to highlight the basic issues relating to Patents, its historical perspectives and the present scenario in India.

About Patent :

A Patent is an exclusive right granted by the government to an Inventor to protect (i.e., exclude others from reproducing, using, or profiting from it without the expressed permission of the patent owner) their invention for a certain time, usually 20 years on disclosing a technical invention, such as how it is made and what it is used for. An invention may be a product (system/apparatus/device) or process (method/ manufacturing) or both and which is novel or new and demonstrates inventive step or technological advancement over the the existing technologies. Threfore there are three following basic conditions for any invention to be patentable:

i) Novelty: The novelty requirement basically states that an invention should never have been published in the public domain It must be the newest which is not similar to anything produced/created earlier.

ii) Inventive steps or non-clarity: The invention should not be obvious to a person skilled in the same field where the invention is concerned. It should not be inventive and obvious for a person skilled in the same field.

iii) Capable of industrial application: The invention cannot exist in the abstract. It must be capable of being applied in any industry, which means that it must have practical uitlity in respect of patent.

Examples of Patent :

Digital twin spark ignition system (DTSI), a patented technology developed by Bajaj is being used in motorbikes and according to company it makes machine more fuel efficient. In 1970, Anand Chakraborty developed oil eating bacteria through modification and got its patent. Oil eating bacteria (Pseudomonas bacteria) has the potential to degrade hydrocarbons at oil spill sites and is very helpful in controlling environmental pollution. Patent of Basmati rice by Rice Tec Company was a controversial patent and Indian government fought for its revocation, as it is long being used by Indian as a food material. Basmati now comes under geographical indicator.

Who can apply for a Patent?

The application for patent can be filed according to the procedure prescribed in its Patent Law by any of the following persons, either alone or jointly with any other person.

i) True and first inventor;

ii) True and first inventor's assignee; or

iii) Legal representative of deceased true and first inventor or his/her assignee.

Foreigners can also apply for patent in India, but it is necessary that the country in which such applicants, should also be providing such reciprocal rights to the Indian nationals.

Rights and Obligations of the Patentee :

Rights of the Patentee :

- Right to use of patent: A patentee has the exclusive right to make exercise, sell or distribute the patented article or substance in India, or to use or exercise the method or process if the patent is for the a person only during the term of the patent.
- Right to grant license: The patentee has the discretion to transfer rights or grant license or enter into some other arrangement for a consideration. But such must be in writing and registered with the Controller of Patents, for it to be legitimate and valid.
- Right to Surrender: A patentee has the right to surrender his patent, but before accepting the offer of surrender, a notice of surrender is given to persons whose name is entered in the register as having an interest in the patent and their objections, if any, considered.
- Right to sue for infringement: The patentee has a right to institute proceedings for infringement of the patent in a District Court having jurisdiction to try the suit.

Oblications of the Patentee

- Government use of patents: A patented invention may be used or even acquired by the Government, for its use only; it is to be understood that the Government may also restrict or prohibit the usage of the patent under specific circumstances. Apart from this, the Government may also sell the article manufactured by patented process on royalties or may also require a patent on paying suitable compensation.
- Compulsory Licenses: If the patent is not worked satisfactorily to meet the reasonable requirements of the public, at a reasonable price, the Controller may grant compulsory license to any applicant to work the patent.
- Revocation of patent: A patent may be revoked in cases where there has been no work or unsatisfactory result to the demand of the public in respect of patented invention.
- Invention for defense purposes: such patents may be subject to certain secrecy provisions, i.e. publication of the invention may be restricted or prohibited by directions of Controller.
- Restored Patents: Once lapsed, a patent may be restored, provided that few limitations are imposed on right of the patentee.

Brief History of Patent :

For a long time laws were only for the protection of tangible property as understood in the historic sense. Industrialization however saw the advent of several landmark inventions and it was a matter of time before concepts and ideas of the mind became the subject of protection under law. The main motto to enact patent law is to encourage inventors to contribute more in their field by awarding them exclusive rights for their inventions.

The first step of the patent in India was act VI of 1856. The Act was repeated by Act IX of 1857 as it had been enacted without the approval of the British Crown. Fresh legislation was snacted for granting 'exclusive privileges' (making, selling and using inventions in India and authorizing others to do so for 14 years from the date of filling specification) was introduced in 1859 as Act XV of 1859. This legislation undergoes specific modifications of the previous legislation, namely, grant of exclusive privileges to useful inventions only, an extension of priority period from 6 months to 12 months. This Act was again amended in 1872, 1883, and 1888. The Indian Patent and Design Act, 1911 repeated all previous acts. The Patent Act 1970, along with the Patent Rules 1972, came into force on 20 April 1972, replacing the Indian Patent and Design Act 1911. Again, The Patents Act, 1970 was amended by the Patents (Amendment) Act, 2005, which was brought into force from 01.01.2005, regarding extended product patents in all areas of technology including food, medicine, chemicals and microorganisms. Following the amendment, provisions relating to Exclusive Marketing Rights (EMR) have been repeated, and a provision has been introduced to enable the grant of compulsory license.

Patent Statistics :

A) Trend of IPRs Granted/Registered

A comparative trends of IPRs granted/registered (and disposed) during the last 5 years is given below.The figures in brackets indicate the total disposal of applications.

Table-1

IPR/YEAR	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Patents	13045 (47695)	15283 (50884)	24936 (55945)	28385 (52755)	30073 (35990)
Designs	10020 (10788)	9483 (11414)	12256 (14701)	9147 (9281)	15262 (15655)
Trademarks	300913 (555777)	316798 (519185)	294172 (419566)	255976 (294944)	261408 (318878)
Geographical Indications	25	23	22	05	50
Semiconductor Integrated Layout Design	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Copyrights	19997 (39799)	14625 (25943)	16029 (22516)	16399 (19477)	20673 (20820)

Source Annaul Report 2021-2022 of Intellectual Property Rights, Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India.

From Table-I, it is observed that there has been a steady increase of patents granted than other IPRs over the years.

B) Trends in Patent Applications :

Table-2

The trends of last five years in respect of Patent applications filed, examined, granted and disposed are given below :

YEAR	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Filed	47854	50659	56267	58503	66440
Examined	60330	85426	80080	73165	66571
Granted	13045	15283	24936	28385	30073
Disposal	47695	50884	55945	52755	35990

Source Annaul Report 2021-2022 of Intellectual Property Rights, Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India.

From Table-2, it is observed that there has been constant increase of filing of patent applications from 2017-18 to 2021-22. During the year 2021-22, a total of 66440 patent applications filed exhibiting an increase of about 13.57% as compared to previous year.

C) State-wise Filling of Patent Applications by Indian Applicants :

Out of total number of ordinary applications filed by Indian applicants during 2021-22, Tamilnadu occupies the first position while Maharashtra and Uttarpradesh occupy second and third place, respectively. This year state like Tamilnadu showed remarkable leap in filing compared to last year and occupies first place in the list. Similarly states like Karnataka, Punjab, Telengana and Haryana along with UTs like Chandigarh, Jammu and Kashmir and Daman & Diu also increased their filing, hence contributing immensely to the overall patent applications filed by Indian applicants. Top filing states/Union Territories are (number of applications in brackets) Tamilnadu (5262), Maharashtra (4566), Uttarpradesh (3622), Karnataka (3222), Punjab (2197), Telengana (1750), Delhi (1673), Gujrat (1067), Hariyana (998), Andhra Pradesh (934), Uttrakhand (533), Madhya Pradesh (488), Rajasthan (465), Kerala (454), West Bengal (453), Chandigarh (348), Odisha (328), Himachal Pradesh (268), Jharkhand (225), and Assam (150).

Conclusion :

Patents can provide great value and increased returns to individuals and companies on the investment made in developing new technology. Patenting should be done with an intelligent strategy that aligns business interests to implement the technology with a wide range of options in search of how, where and when to patent. As an example, with a focus on international considerations and regulations in specific countries, it is possible for company to achieve significant savings and improve the

rights gained using patents. In this context, it is worth mentioning that the present Patent (Amendment) Act, 2005 covers all aspects and relevant provisions of IRIPS, Paris Convention and other conventions, and also the Doha Declaration to serve the best interest of the nation.

Reference :

i) Dr. Mashelkar, R. A. Preface to the book 'Intellectual Property Rights : Unleashing the Knowledge Economy' by Prabudha Ganguly (2001).

ii) Annual Report 2021-2022 of Intellectual Property India. The office of the Comptroller General of Patents, Designs, Trademarks and Geographical Indications, Government of India, Ministry of Commerce and Industry. Department for Promotion of Industry & Internal Trade. P.7-20.

iii) Dr. Sharma's, Intellectual Property Rights and Social disclosure : Frameworks of Analysis to Protect Traditional Knowledge and Folklore wisdom. Southern Economist, 1 (43), 17.

iv) Ravichandran, M., Thyagrajan, V. and Munikrishnan, M. (2004, January-March), Intellectual Capital : Components and Measurement. The Indian Journal of Commerce, 1 (57), 93.

v) Parulekar Ajit and D 'Souza Sarita, Indian Patent Law, (1st Edn 2006) Macmillan India Ltd., New Delhi.

--::::::::::::--

ওদের হৃৎস্পন্দন

ড. লিপিকা পণ্ডা
(বাংলা বিভাগ, রামনগর কলেজ)

শোনো একটা গল্প বলি। না, গল্প ঠিক নয়। কেননা গল্প মানেই তো কিছু কল্পনা। কিছু সত্য আর তার সাথে অনেকখানি নিজের মনের থেকে একেবারে মাপসই করে বসানো কিছু বানানো কথা। তবে এ ঠিক তা নয়। একেবারে বাস্তব। নিজের চোখে দেখা, প্রতিদিন অনুভব করা কিছু বিষয়।

আমি যেখানে থাকি তার নীচের মাটিও আমার নয়, আবার ওপরের ছাদও আমার নয়। ওই যেমন করে মানুষ বলে এ আমার একেবারে নিজস্ব। কেননা বিশাল পৃথিবীর ছোট্ট এক কোণের এই অংশটুকু অর্থাৎ ভূমিটুকু আমি অর্থের বিনিময়ে নিজের করে নিয়েছি। সেজন্য দলিল রয়েছে, সরকারকে রেভিনিউ দিয়েছি ইত্যাদি প্রভৃতি ইত্যাদি। অতএব এর ওপরের সরলরেখা বরাবর যা কিছু সব কিছুর মালিক আমি। কিন্তু আমি সেরকমের কোনো মালিকানার অধিকারী নই। কেননা ভূমি আমার নয়। ভূমি আর আকাশের মাঝে অনেকটা ঝুলন্ত অবস্থাতেই আমার অবস্থান। ওই আধুনিক বাংলায় যাকে বলে ফ্ল্যাট। 'বাংলায়' শব্দটা ব্যবহার করলাম এ কারণেই যে এরকম ইঙ্গো-বঙ্গ বাংলাতেই আমরা সাচ্ছন্দ্য বোধ করি অনেক বেশি।

আধুনিক যুগে ভূমির অধিকার মানুষের যতখানি কমে আসছে ততই আকাশ জয় করছে মানুষ। কারণ, আকাশ অধিকারের কোনো সীমা নেই। তাই গাছপালা আজ তার শিকড়ে পৃথিবীর কেন্দ্রের সন্ধান ততখানি পায় না। মানুষ তার অবস্থানের ছোট্ট পরিসরে তার শখ-আহ্লাদ মেটায়ও তেমনি ছোট্ট ছোট্ট ভাবে। তাই টবের পরিমিত মাটিতে পরিমিত খাদ্য জল আর আলো হাওয়াতে গাছেরাও কেমন যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারাও যেন এখন বুঝে গেছে বেশি চাইতে নেই। মালিকের মতো তারাও নিজেদের চাহিদাগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছে। তাদের অবস্থান এখন বাড়ীর ছাদে বা ব্যালকনিতে অথবা অন্য কোথাও।

এখন একটা নতুন শব্দ তৈরী হয়েছে ছাদ-বাগান। কিন্তু আমার গাছেদের অবস্থান ছাদে নয়। কেননা ওই যে আগে বলেছি আমার অবস্থান ঝুলন্ত। তাই গাছেরা আমার জানালায় থাকে। তিনটে জানালা আছে আমার। তবে বেশ বড় বড়। আগেই বলেছি ভূমির অধিকার মানুষের যত কমছে ততই মানুষ অন্য জায়গাগুলোতে তাকে পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই এখন বেরিয়েছে 'বক্স জানালা'। তবে আমার বক্সের পরিমাণটা একটু বেশী। আসলে এটা অনেকটা পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো। ফ্ল্যাট যিনি বানিয়েছিলেন (ডেভলাপার) এটি তাঁর এ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ। তাঁর অনভিজ্ঞতার কারণে এই অতিরিক্ত অংশের অধিকার লাভ করেছি আমরা।

জানালার একটু বড় পরিসরেই কতকগুলো টব বসিয়েছি আমি। ক'দিন আগে বোনের বাড়ী গেছলাম। বোন আমাকে বেশ কিছু গাছের বীজ দিয়েছিল। ছিল ঝিঙে, ঢেঁড়স, পুঁই, কুমড়ো, বরবটি, লাউ ইত্যাদি। নতুন উৎসাহে কোনো বিচার না করে একে একে টবে পুঁতে দিয়েছি বীজ। ক'দিন পরে একে একে উঠতে শুরু করেছে অঙ্কুর। এর আগে ক্যাকটাস, তুলসী এইসব গাছ লাগিয়েছি। সব্জির গাছ এই প্রথম। তাই আনন্দ আর উৎসাহটা একটু অধিক।

যাইহোক, ক'দিন যেতে না যেতেই গাছগুলো বড় হয়ে উঠতে লাগলো। প্রতিদিন জল, চা-পাতা, সার—এইসব নিয়ম করে দিয়ে চলেছি। ঢেঁড়শ, পুঁই, ঝিঙে, বরবটি, কুমড়ো গাছ নিজেদের বিস্তার করতে লাগলো। ঝিঙে বরবটি লতানো। কুমড়ো একটু ছোট আছে। তাই ঝিঙে আর বরবটিকে তুলে দিলাম জানলার গ্রিলে। দু'দিক থেকে দু'জনে এগিয়ে আসছে। যেন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সৈন্য। দু'জনের বৃদ্ধি এবং চলন চোখে পড়ার মতো। প্রতিদিন বিছানা থেকে উঠে ঘুম জড়ানো চোখে এসে প্রথমেই দাঁড়াই জানলায়। খুব ভালো লাগে ওদের লকলকে সবুজ শরীরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে। কৈশোরের নতুন পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ আস্বাদনের সে যেন কী এক উন্মাদনা ওদের চোখে-মুখে। প্রতিদিন তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করি। বিকেলে কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে আবার গিয়ে দাঁড়াই ওদের পাশে।

হাত বুলিয়ে দিই গায়ে।

পুঁইগুলোকে মনে হয় যেন পদাতিক বাহিনী। নীচে নীচে চলছে। আমার অপরিনামদর্শিতার জন্য এক একটা টবে তাদের ততোধিক অবস্থান। ফলে প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যেও। ওদের ছোট্ট ছোট্ট ডানা এক এক রাত্রির মধ্যে যেন দ্বিগুণ আকার ধারণ করছে। একজন আর একজনকে দমিয়ে চলার জন্যে পাতায় পাতায় যেন খণ্ডযুদ্ধ লাগিয়ে দিচ্ছে। আমি হচ্ছি দুই পক্ষের মধ্যস্থতাকারী। মাঝে মাঝে গিয়ে পাতাগুলোকে সরিয়ে সরিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলি—এমনি করে রেষারেষি করতে নেই। মিলে-মিশে থাকতে হয়। ওরা আমার কথা হয়তোবা একটু বুঝে ক'দিন চুপচাপ থাকে। কিন্তু আবার বুঝি কৈশোরের অবুঝ মনটা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পুনরায় লাগিয়ে দেয় দ্বন্দ্ব। তখন আমাকে আবার গিয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়। বেশ লাগে ওদের। কী সুন্দর ওরা। কেমন ছেলেমানুষ।

সেদিন রান্নার মেয়েকে বললাম—সব্জির খোসাগুলো রেখে দেবে তো। গাছের গোড়ায় দেবো। ও রেখে দিয়েছিল। সময় করে সন্ধ্যেবেলা গোড়ার মাটি একটু একটু উসকে সব্জির খোসাগুলোকে ভরে দিয়েছিলাম।

প্রায় দু'দিন পরে তেমনি করে ভোরবেলা দাঁড়িয়েছি। ক'দিন বেশ গরম পড়েছিল। সূর্যের একাধিপত্য। গুমোটে অতিষ্ঠ অবস্থা। একসময় ধীরে ধীরে আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টিও হয়েছে রাতে। সকালে মিঠে রোদ এসে পড়েছে। তার ছোঁয়া এসে লেগেছে আমার জানালায়। টবের গাছগুলো বেশ চক্‌চক্ করছে। হঠাৎ চোখ পড়ল মাটির দিকে। দেখলাম গাছের গোড়ায় ওটা কী? কেঁচো না অন্য কিছু! খানিকটা বেরিয়ে আছে যেন। পরিত্যক্ত ঝিঙের বোঁটাটা নিয়ে একটু খুঁটিয়ে দিলাম। মনে হল ও যেন চমকে উঠলো। আর একবার খোঁচা দিলাম। এবারও তেমনি। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো। বুঝতে অসুবিধে নেই এ কেঁচো। বেশ নধর চেহারা। একটু একটু করে সে চলতে শুরু করলো। তারপর একসময় তিড়িং মিড়িং করে টবের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত লাফাতে লাগলো। যেন প্রতিবাদ করতে লাগলো ক্রমাগত। আমি খানিকটা থ মেরে গেলাম। কী ব্যাপার! এমন তো কখনো দেখি নি। তবে এ কী অন্য কিছু? না ঠিকই তো মনে হচ্ছে। কেঁচোই তো। এরকম ভাবছি। এক সময় দেখলাম সে তার স্বভাবসিদ্ধ পরিচিত চলনে টবের এক প্রান্তে গিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকে যেতে লাগলো মাটির গভীরে। খানিকক্ষণ তেমনি করে দাঁড়িয়ে থেকে অনুভব করলাম আসলে ও ঘুমোচ্ছিল। ভোরের ঘুম অত্যন্ত প্রিয়। ক'দিন গরমের দাপটে সূর্যের আধিপত্যে অনুকূল পরিবেশের অভাবে মাটির তলার গুমোটে ঘুম হয়নি হয়তো ভালো করে। এখন নিরালায় নিভৃতে শীতল পরিবেশে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিল বুঝিবা। আর আমি এসে তার বিঘ্ন ঘটালাম।

আমার এ ব্যাখ্যা হয়তো হাস্যকর। কিন্তু সত্যিই কী হাস্যকর? কেননা প্রতিটি প্রাণীর শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকর্মের মধ্যে একটি অত্যাবশ্যক বিষয় হল তার ঘুম। আর সেই ঘুম যদি কেউ ভাঙিয়ে দেয় তখন তো রাগ হবেই। প্রতিবাদও করবে সে তার মতো করে। আমরা আসলে এসব বিষয় তেমন করে ভাবি না। তাই হাসি পায় বা বিস্ময় জাগে। সেদিনের সেই ঘটনার পর অনেকক্ষণ মনের মধ্যে ছিল তার রেশ।

এমনি করেই কেটে গেল বেশ ক'টা দিন। গাছেদের সঙ্গে যেন এক আত্মিক সম্পর্ক তৈরী হয়ে যাচ্ছে। দিনের পর দিন তা আরও হয়ে উঠছে গভীর থেকে গভীরতর।

সেদিন হঠাৎ মনে হল গ্রিলের ওপরের দিকের বরবটি আর ঝিঙে গাছের বৃদ্ধি যেন স্থগিত হয়ে গেছে। দেখলাম নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে দু'জনে যেন থিতু হয়ে গেছে। কী হল! ভাবলাম খাবার কম হয়েছে বুঝিবা। তারও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করলাম। দেখলাম নিজেরা দূরে দূরে থেকে লতিয়ে লতিয়ে ঝুলছে। যতই তুলে দেওয়ার চেষ্টা করি না কেন একই ব্যাপার। ভাবলাম বুঝি জায়গা হচ্ছে না। দু'জনকে আলাদা করে দিতে হবে। করতে হবে সময় করে। কাজের চাপে হয়ে উঠছিল না। দু'জনের গতিবিধিতেও এত তীক্ষ্ণভাবে নজর দেওয়া সম্ভব হয় নি। শনিবারে কর্মস্থল থেকে ফিরে আসার পর দুটো দিন ছুটি পাই। ভাবলাম ওই দু'দিনে অবশ্যই কাজটা সেরে ফেলতে হবে।

রবিবারের সকাল। যথোপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়েই শুরু করলাম কাজটা। উদ্দেশ্য ঝিঙে গাছটাকে নিয়ে আসবো পাশের জানলায়। যখন টবটাকে ধরে টান দিলাম দেখলাম আকর্ষগুলো গ্রিলের রেলিংয়ে রেলিংয়ে জড়িয়ে গেছে।

আকর্ষগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেওয়ার পরে গাছটার ঝুলে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু না। দেখলাম সে আকর্ষ দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে চলে গেছে ওপারে। বরবটি গাছটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। বরবটি গাছও তেমনি। সেও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তেমনি করে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সেও। সে এক অদ্ভুত খণ্ডযুদ্ধ। প্রতিপক্ষ দু'জনে। কেউ কারুর অধিকার ছাড়তে রাজি নয়। আকর্ষে আকর্ষে জড়িয়ে সে এক অদ্ভুত লড়াই। আমি ওদের আকর্ষগুলো সাবধানে কাটছিলাম আর অনুভব করছিলাম বেঁচে থাকার লড়াইটা। মনে হচ্ছিল ক'দিন যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখছিল সে হয়তো পরস্পরকে চিনে নেওয়ার জন্যে। সময় দিচ্ছিল প্রতিপক্ষকে পিছু হটার। হয়তো নিজের শক্তি বৃদ্ধি করছিল পরস্পর। যখন সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তখন সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ। কিন্তু এক্ষেত্রে কে আগে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল সে বোঝা সম্ভব হয় নি আমার। কারণ, আমি কিছু দিন ব্যস্ত ছিলাম। তাছাড়া ভাবিই নি এই ধরণের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের। দেখলাম দু'জনেই নিজেদের অধিকার সাব্যস্ত করতে চায়। কেউ কারো চেয়ে কম নয়।

বহুক্ষণের প্রচেষ্টায় এবং যত্নে একসময় দু'জনের দ্বৈরথ বন্ধ করা গেল। মুক্ত করা গেল দু'জনকে। তারপর ধীরে ধীরে টবসহ ঝিঙে গাছ এনে রাখলাম পাশের জানালায়। তুলে দিলাম ওকে তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে গ্রিলে। ছড়িয়ে দিলাম সারা গ্রিল জুড়ে। মনে হল দমে গেল বুঝিবা। কিন্তু পরদিন সকালেই দেখলাম ডোগায় ডোগায় বেরিয়েছে ওর অসংখ্য আকর্ষ। ধরতে চাইছে সে, বাড়তে চাইছে সে নিজের মতো করে। মুক্ত পৃথিবীতে গড়তে চাইছে নিজের সাম্রাজ্য। দু-একদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল অজস্র কুঁড়িতে কুঁড়িতে ভরে গেছে সারা অঙ্গ। তারপর ফুলে ফুলে ভরে যাচ্ছে সে প্রতি সন্ধ্যায়। সকাল হতেই গিয়ে দাঁড়াই ওর কাছে। দেখি রাতে ফোটা ফুল সকালে টুপটাপ ঝরে পড়েছে নীচে থাকা তুলসীতলায়। যেন অর্ঘ্য দিচ্ছে সে মা-তুলসীর চরণে। যেন চন্দ্রপ্রিয়া। তার মধ্য থেকেই সন্তানবতী হয়েছে সে।

আর বরবটি সেও তো তাই। যুদ্ধ করে যে জমি ফিরে পেয়েছে সে, এখন সেই সাম্রাজ্যে সংসার গড়তে মন দিয়েছে। প্রতিদিন বেগুনী ফুল ফোটাচ্ছে। এখন সে তিন সন্তানের মা। তাদেরই যত্ন করে লালপালন করতে ব্যস্ত সে। হয়তোবা নতুন অতিথি আসবে তার ঘরে। এরা সাবালক হলে বা পরিণত হয়ে স্বনির্ভর হলে আবার নতুন করে সংসার সাজানোর পরিকল্পনা করবে সে।

আর আমি প্রতিদিন বেলা শেষে ফিরে আসি, আর ওদের গল্প শুনি। ওদের জীবনের গল্প, বেঁচে থাকার লড়াই। আর অনুভব করি ওদের হৃৎস্পন্দন।

———ঃঃ———

বিদ্যাধনং সর্বধনং প্রধানম্

ক্যাপ্টেন ড . নরনারায়ণ দাশ
(প্রধান অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রামনগর কলেজ)

বিদ্যা মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের প্রধান সহায়ক হয়। জ্ঞানার্থক বিদ ধাতুর পর ক্যপ্ ও টাপ্ প্রত্যয় যোগে 'বিদ্যা' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে—''সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'', অর্থাৎ বিদ্যা মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন—"Education is the manifestation of perfection already in man." বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—''তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।'' শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। যে দেশ যত শিক্ষিত সে দেশ ও তার সংস্কৃতি-সভ্যতা সেই পরিমাণে সমুন্নত। তাই সরকার সময়চক্রে বিভিন্ন শিক্ষানীতি প্রণয়ণ করে দেশবাসীকে সুশিক্ষিত করে থাকেন। আমাদের ইতিহাস পৃষ্ঠাকে অনুধ্যান করলে দেখা যায়, প্রাচীন গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষকে অনেক সুশিক্ষিত করে তুলেছে। মধ্যযুগে নালন্দা ও তক্ষশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। ইংরেজদের শাসনকালে 1835 খ্রীষ্টাব্দে লড্ডেল হাউস Job Oriented Education প্রণয়ণ করেছিলেন। 1986 সালে স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নবোদয় শিক্ষা প্রণয়ণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে সর্বশিক্ষা, জ্ঞান কমিশন ও নূতন শিক্ষানীতি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুসমৃদ্ধ করে তুলেছে। সুশিক্ষিত মানুষ সময়ের অপব্যবহার না করে অল্প সময়ের মধ্যে কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়ে থাকেন। তাই নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে—''কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালগচ্ছতি ধীমতাম্''। ''বিদ্যাধনং সর্বধনং প্রধানম্ ইতি''—উক্ত প্রবাদ বাক্যটির অর্থ হলো সমস্ত ধন থেকে বিদ্যাধন শ্রেষ্ঠ। জনসমাজকে সুশিক্ষিত করার জন্য চাণক্য-বিদুরক-ভর্তৃহরি প্রভৃতি আচার্য্যগণ বহু সুভাষিত শ্লোক রচনা করেছেন। তার মধ্যে বিদ্যার প্রশংসা করে বলেছেন—

''ন চৌরহার্য্যং ন চ রাজহার্য্যং ন ভ্রাতৃভার্য্যং ন চ ভারকারী,
ব্যয়ে কৃতে বর্দ্ধত এব নিত্যং বিদ্যাধনং সর্বধনং প্রধানম্।।''

i) **ন চৌরহার্য্যম্**—সংসারে মানুষের অর্জিত ধনসম্পদকে চোর জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে হরণ করে থাকে। কিন্তু বিদ্যা এরূপ ধন তাকে কেউ চুরি করিতে পারবে না।

ii) **ন রাজহার্য্যম্**—দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যে জমিবাড়ী, ধনসম্পদ রোজগার করে, ভারতীয় আইনবিধি অনুসারে কর (Tax) দিতে হয়। কিন্তু বিদ্যা অজস্র অর্জন করলেও কোন কর দিতে হয় না।

iii) **ন ভ্রাতৃভার্য্যম্**—ভারতীয় শাসনবিধি অনুসারে পিতার সম্পদের উপর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলের সমান অধিকার রয়েছে। পিতার অন্তে সমপরিমাণে উক্ত সম্পদ উত্তরসুরীদের মধ্যে সমানরূপে বন্টন হয়। কিন্তু মানুষের অর্জিত বিদ্যার ভাগ কাউকে দেওয়া হয় না।

iv) **ন চ ভারকারী**—প্রত্যেক জিনিসের সমপরিমাণে অবস্থান অনুসারে ওজন রয়েছে। সেই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সুরক্ষিত ব্যবস্থা বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু যত সুশিক্ষিত মানুষ হন না কেন বিদ্যা তাঁর কাছে ভারী মনে হয় না।

v) **ব্যয়কৃতে বর্দ্ধত এব নিত্যম্**—চরাচর জগতে প্রায় দেখা যায় ব্যয় করলে তা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বিদ্যা এরূপ সম্পদ যা অন্যদের প্রদান করলেও শেষ না হয়ে বরং বর্দ্ধিত হয়। তাই উক্তি রয়েছে—

''অপূর্বকোহপি কোষোহয়ং বিদ্যতে তব ভারতী।
ব্যয়েন বৃদ্ধিমাপ্নোতি ক্ষয়মাপ্নোতি সঞ্চয়াৎ।।''

উক্ত শ্লোক থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিদ্যারত্ন সকলরত্ন থেকে প্রধান। যথার্থরূপে বলা হয়েছে—''বিদ্যারত্ন মহাধনম্''।।

বিদ্যাপ্রশস্তি ঃ

উপনিষদে বিদ্যাকে পরাদেবতারূপে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। শ্রীমৎভগবত গীতাতে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানকে পবিত্র বস্তুরূপে বর্ণনা করেছেন। যথা—''ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে''। আচার্য্য চাণক্য নীতিশাস্ত্রে বর্ণনা করেছেন—''স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে''। অর্থাৎ, রাজা রাজকীয় শক্তি দ্বারা নিজ দেশে পূজিত হন, কিন্তু বিদ্বান সর্বত্র পূজা পান। নীতিশাস্ত্রে প্রণেতাভর্তৃহারী বলেছেন—''বিদ্যা রাজসু পূজিতা ন তু ধনং বিদ্যাবিহীন পশুঃ।'' বিদ্বান ব্যক্তি প্রতিভা দ্বারা সভাগৃহকে সুশোভিত করেন। বিদ্যাভাবে মানষ পশুর সঙ্গে সমতুল্য হয়। যাদের মধ্যে বিদ্যা জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতি গুণ না থাকে তিনি মর্ত্যধামে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেও মৃগের ন্যায় জীবনযাপন করেন।

বিদ্যা উপার্জনের উপায় ঃ

বিদ্যালাভের উপায় বিষয়ে শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—''তদ্বিদ্ধিপ্রণিপাতেন প্রণিপ্রশ্নেন সেবয়া।'' অর্থাৎ গুরুজনদের প্রতি প্রণাম, প্রশ্নোত্তর ও সেবা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। অন্যত্র বলা হয়েছে—''শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্।''

পুনরায় নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে—

''গুরু শুশ্রুষয়া বিদ্যা পুষ্কলেন ধনেন বা।
অথবা বিদ্যয়া বিদ্যা চতুর্থী নোপদ্যতে।।''

অর্থাৎ গুরুজনের সেবা, ধনসম্পদ ও বিদ্যা বিনিময়ে বিদ্যালাভ হয়ে থাকে। আলংকারিক মম্মট বলেছেন—শক্তি, নিপুণতা ও অভ্যাসের দ্বারা কাব্য নির্মাণ করা যায়।

নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে—''অভ্যাসে ধার্য্যতে বিদ্যা।''

উপসংহার ঃ

আধুনিক সমাজে সুশিক্ষিত ব্যক্তি সম্মানিত হচ্ছেন না। অশিক্ষিত ব্যক্তির কাছে প্রচুর অর্থোপার্জন দেখে বিদ্যাকে হেয় করেন। কিন্তু শাস্ত্রমতে বিদ্যাকে হেয় করা উচিত নয়। নীতিকার উদাহরণের দ্বারা বলেছেন—বারাঙ্গণা কখনো কূলবধূ হয় না। পুনশ্চ বিধাতা মানুষের যে কোন সময় প্রাণ নিতে পারেন কিন্তু তাঁর কর্মদক্ষতাজনিত কীর্তিকে অপহরণ করতে পারে না। যথা—

''বৈদগ্ধকীর্তিপহর্তুমসৌ ন সমর্থাঃ।''

——ঃঃ——

শালগ্রামের বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক সুরেন কুমার মহাপাত্র
(সংস্কৃত বিভাগ, রামনগর মহাবিদ্যালয়)

'শালগ্রাম' হচ্ছে এক জাতীয় পাথর, যাকে বৈজ্ঞানিক মতে আমলোনাইট বলা যায়। যেটি ছিদ্রযুক্ত গোলাকার জীবাশ্ম। জীব+অশ্ম। অশ্ম শব্দের অর্থ পাথর, যেটি অনেক আগে জীবিত ছিল। এই শিলা বিশেষত নেপাল রাজ্যের মুক্তিনাথ নামক স্থানে গন্ডুকী নদী থেকে পাওয়া যায়। আমরা তিন রকম শিলা দেখতে পাই—কালো, সাদা ও হালকা লাল। বেশিরভাগ কালো পাথরকেই শালগ্রাম বলা হয়। সেই পাথরের মাঝখানে বজ্রকীট বলে একটা পোকা, যে পাথরকে ফুটো করে তার ভিতরে, বাইরে চক্রের মতো আরো অনেকরকম দাগ ক'রে দেয়। বজ্রপোকা যে গর্ত তৈরি করে সেই গর্তকে আমরা শালগ্রাম শিলার মুখ বলে থাকি। যে পাথরের বাইরে শুধু চিহ্ন থাকে ও গোলাকাকৃতি হয়ে থাকে তাকে আমরা শালগ্রাম বলে ধরি না। কিন্তু যে পাথরে গর্ত ও চিহ্নগুলি থাকে তাকে আমরা রঘুনাথ বলি। বস্তুতঃ হিন্দু ধর্মে কাঠপাথরকেও ভগবানের মতো পুজো করা হয়। যেমন শিবের নিরাকার স্বরূপ শিবলিঙ্গের মতো, সেই অনুযায়ী ভগবান শ্রীনারায়ণের নিরাকার রূপ হলেন শালগ্রাম বা রঘুনাথ। শাস্ত্রে বলা আছে—

বর্তুলং কৃষ্ণবর্ণমতিশয়রুচিরং লক্ষণষ্টাদশং চ।
যুক্তং স্যাৎ দর্ভমধ্যে কতিপয়সুঢলং চক্রচিহ্নং মুরারে।
পত্রং তে বৈনতেয়ো তদুপরি বসতো হৈমযুক্তং সদৈব।
পূজা কালে ত্বমেব স্বভবতু বরদো সম্মুখী গণডুকীয়ঃ।।

অর্থাৎ শালগ্রাম বা রঘুনাথের স্বরূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে, শিলা গোলাকৃতি, কালো রঙের অত্যন্ত সুন্দর ও আঠারো রকম দেখা যায়। সেই শিলায় অবশ্যই গর্ত থাকে এবং সেই গর্তের ভিতরে চক্রচিহ্ন থাকে। পত্রম্ বলতে বাহন, অতএব ভগবান কৃষ্ণমুরারির বাহন হল বৈনতেয় বা গরুড়। আরো একটা বৈশিষ্ট্য হলো শালগ্রাম সব সময় সে হৈমযুক্ত অর্থাৎ ঠাণ্ডা লাগে। যেহেতু বিষ্ণু স্বরূপ শালগ্রাম সেজন্য আমাদের কল্যাণ করেন।

শালগ্রাম কেউ কেউ বলে তেত্রিশ রকম, আবার কেউ কেউ বলে চব্বিশ রকম। কিন্তু কার্তিক পুরাণ অনুযায়ী আঠারো রকম শালগ্রাম হলেন, যথা— লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মীজনার্দন, রঘুনাথ, দধিবামন, শ্রীধর, দামোদর, বলরাম, রাজরাজেশ্বর, অনন্ত, মধুসূদন, গদাধর, হয়গ্রীব, নরসিংহ, লক্ষ্মীনৃসিংহ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সুদর্শন, অনিরুদ্ধ।

শ্রীভবিষ্যোত্তর পুরাণে বর্ণনা আছে যে, যুধিষ্ঠিরকে একদা ভগবান পুরুষোত্তম বললেন, 'নেপালের গন্ডুকী নদীর তীরে হিমালয়ের দক্ষিণে দশযোজন ব্যাপী মুক্তিনাথ বলে মহানগরের মাঝখানে শালগ্রামের উৎপত্তিস্থল।' সেই শিলাকে আমরা ভগবানের স্বরূপ মনে করে প্রতিদিন স্নান অভিষেক ক'রে তুলসীপাতা চন্দন ফুল ইত্যাদি দিয়ে পুজো করা এবং তুলসীপাতা ও চরণামৃত পান করে সবরকম রোগ, শোক, মোহ, দারিদ্র্য, ব্রহ্মহত্যাদি দোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষাদি চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তির সাথে সাথে কোটি যজ্ঞের ফল ও মুক্তিলাভ করা যায়। সেই জন্য বলা আছে যে—

অকাল মৃত্যু হরণং সর্ব ব্যাধি নিবারণম্।
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে।।

সেই শালগ্রাম ভিতরে আরেকটা বিষয় পাওয়া যায় যে, আলোকের সামনে শালগ্রাম রেখে দিলে তার ভিতরে লাল অংশ দেখা যায়। এই শালগ্রামকে রত্নগর্ভা বলা যায়। আরও বলা আছে যে, শালগ্রামের সাতটি ছিদ্র ও চৌদ্দটি চক্র আছে, তাকে অনন্তপদ্মনাম মূর্তি বলা যায়। আরও একটা শালগ্রাম আছে যার দুটো ছিদ্র, চারটি চক্র থাকে, তাকে নারায়ণমূর্তি বলা যায়। যে শালগ্রামের গর্তটিতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করার মতো হয়ে থাকে সেই শালগ্রামকে নৃসিংহ বলা যায়। সে যাই হোক্ না কেন, এ সম্পর্কে একটা পুরাণ কথা আছে যে, 'মা তুলসী লক্ষ্মীর অংশ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সে রাক্ষস জলন্ধরকে বিয়ে করেছিলেন। তুলসী মাতার সতীত্ব বলে জলন্ধরকে কেউ মারতে পারতো না। জলন্ধর দেবতা ও

মানব সবাইকে অত্যাচার করতেন। স্বর্গলোক পৃথিবীলোক সবাই ত্রাহি ত্রাহি ব'লে বিষ্ণুদেবকে আরাধনা করতেন। একদা স্বর্গলোককে আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন। জলন্ধরের পত্নী বৃন্দারানি তার পতির বিজয়ের জন্য স্বতন্ত্র পুজোর আয়োজন করেছিলেন। হয়তো জলন্ধর বিজয়ী হ'য়ে স্বর্গলোক আয়ত্ত করবে, সেই জন্য দেবতারা একসঙ্গে বিষ্ণুকে মা তুলসীর পুজো ভঙ্গ করার জন্য অনুরোধ জানালেন। ভগবান বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ নিয়ে তাঁর পত্নীর সামনে দাঁড়ালেন। তার পত্নীও স্বামীকে দেখে পুজো ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার পুজো ভঙ্গ হওয়ার জন্য দেবতারা একসঙ্গে তার মাথা ছেদন করলেন। ফলে সেই মাথা এসে তার পত্নীর পায়ের কাছে পড়লো। ভগবান বিষ্ণু নিজের স্বরূপ দেখিয়ে দিলেন। বিষ্ণুর এই কপট আচরণের জন্য মাতা তুলসী দেবী রেগে বিষ্ণুকে অভিশাপ দিলেন যে, আপনি পাথর হয়ে যাবেন। বিষ্ণুদেব সেই অভিশাপকে মাথায় নিয়ে শালগ্রাম হ'য়ে গেলেন। ভগবান বিষ্ণু মাতা তুলসীকে গন্ডুকী নদী রূপে প্রবাহিত হ'য়ে শাপমুক্ত করার জন্য অনুরোধ করলেন। অনুরোধ রক্ষা ক'রে মাতা গন্ডুকী নদী হ'য়ে ভগবান বিষ্ণুকে শাপমুক্ত করালেন ও ভগবানের সঙ্গে বৈকুণ্ঠ গমন করলেন। সেই জন্য আজও ভগবানের মাথায় তুলসী পাতা দিয়ে পুজো হয় অর্থাৎ ভগবান তুলসী দেবীকে মাথায় ধ'রে রাখেন। এক কথায় ভক্তাধীনস্ত দেবতা।

শালগ্রাম পুজোর বিশেষ নিয়ম আছে।

যথা—

১। প্রত্যেকের বাড়ীতে একটা মাত্র শালগ্রাম রেখে পুজো করা উচিত।

২। বিষ্ণুর মূর্তি বা ফটো অপেক্ষা শালগ্রামের পুজো করা উচিত।

৩। প্রতিদিন শালগ্রামকে পঞ্চামৃত বা গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে চন্দন ও তুলসী দিয়ে পুজো করা উচিত।

৪। যার বাড়ীতে প্রত্যেকদিন শালগ্রামের পুজো হয় সেই বাড়ীতে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য দুঃখ, শোক, পাপ, ভয়াদি দূরীভূত হয়।

৫। যেহেতু শালগ্রাম বিষ্ণুর স্বরূপ, অতএব শুদ্ধতার সাথে পুজো করা উচিত।

৬। শালগ্রাম ঠাকুরকে রাখার সময় লালকাপড় দিয়ে তার উপরে রাখা উচিত।

৭। যেহেতু বিষ্ণুর প্রিয় তুলসী, প্রতিদিন তুলসী পাতা দিয়ে পুজো করা উচিত।

৮। শালগ্রামকে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন নেই, যে কেউ নিজে পুজো করতে পারে।

৯। বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী যার বাড়িতে শালগ্রাম থাকে সেই বাড়ি তীর্থস্থানের মতো।

১০। শালগ্রাম ও তুলসীদেবীর বিয়ে করালে কন্যাদানের ফল পাওয়া যায়।

সে যাই হোক্ ভারতীয় সংস্কৃতিতে কাঠপাষাণেরও পুজো করা হয়। আমরাও ভক্তি করি এটাতে কোনো দ্বিমত নেই। সেইজন্য বলা আছে যে—

ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবঃ তস্মাত্ ভাবো হি কারণম্।।

——ঃঃ——

SIR ASUTOSH MOOKERJEE : A MULTI-TALANTED PERSONALITY AND AN ARCHITECT IN THE FIELD OF EDUCATION

Dr. Achintya Kumar Samanta
(Associate Professor in Botany, Ramnagar College)

'The whole passion of the life of Sir Asutosh Mookerjee was the intellectual regeneration of his Country.' Prafulla Chandra Roy.

There we found a galaxy of great personalities across the world : Sir Asutosh Mookerjee is one of them from Indian counterpart. Solely he is known to us as **"Banglar Bagh"** in Bengali or the **"Tiger of Bengal"** in English. He comes from a very renowned, dignified, middle class but cultural Brahmin family in Bowbazar, the then Calcutta (now Kolkata) on 29th June, 1864. His father Ganga Prasad Mukherjee was a reputed benevolent/generous personality. He was also an eminent physician and his mother. Jagattarini Devi was an ideal, pious Indian woman.

In 1869 he started his journey in early education at Chakraberia School of Bhowanipore. Then he was admitted to South Suburban School in class V. After passing out 10th Class examination from Calcutta University in 1879, then he entered Presidency College and continuing his studies from 1880 to 1886. He took his B.A. as first position in 1881. He received the **"Ishan Scholarship"** in 1884. Then he moved for pursuing his M.A. examination in mathematics in 1885 and also stood first. Later in 1886 obtained his M.A. degree in physical science and in the same year, he received **Premchand Roychand Studentship** (P.R.S.) as a mark of his outstanding achievements in the field of studies. Gradually he grew up in an ambience of Mathematics, Science and Literature in Calcutta afterwards.

He obtained his LLB degree in 1888 and ultimately perused in career in law. In 1894 he graduated with a degree in Law. From 1899 to 1903 he was a member of the Lieutenant Governor's Council of Bengal as representative of Calcutta Univesity. In 1904 he became the Chief Justice of the Calcutta High Court. He has served as the 22nd and 26th Vice-chancellor of the University of Calcutta from 1906 to 1914 and 1921 to 1923 respectively.

Sir Asutosh Mookerjee was a man of rare, unparalled personality with a real intellect and he had a strong ability to know others very easily. In 1923 he retired from the Calcutta High Court and Calcutta University.

He was one of the prominent educationists of his time and played a pivotal role

in shaping the modern education system in India. As Vice-Chancellor of Calcutta University he played a pioneering role in encouraging post-graduate teaching and research in science. He has taken an initiative for the integration of teaching and research in Bengali, Hindi, Pali and Sanskrit at the University level for the first time in India. He eatablished several new academic undergraduate programmes under the Calcutta University, viz. Comparative Literature, Anthropology, Application Psychology, Chemistry, Art, Ancient History, Hindu Culture, Islamic Culture and many more.

He has done a lot in Education related works during his regime as Vice-Chancellor at Calcutta University. Some of them are University Library at Darbhanga Hall, Printing Press; inclusions of various colleges under Calcutta University; Science and Technology colleges for spreading science and technical education and creating Lecturer, Reader and Professor posts, etc.

Sir Asutosh Mookerjee was an extraordinary Indian academic; Prolific Bengali writer, Novelist, Sociologist, Lawyer, Barrister, Jurist and great Mathematicians and his works include several books in ***English***.

- An Elementary Treatise on the Geometry of Conics (1893); Arithmetic for Schools (1901 & 1911).
- A Diary of Sir Asutosh Mookerjee (1998);
- On Pott's Fuclid (2004);
- Law of Perpetuities in British India [Tagore Law Lectures] (1898) and in ***Sanskrit*;**
- Jimutavahana-Vyayahara Matrika (1912) and in ***Bengal*.**
- Jatiya Sahitya (1932, 1995) and Translate in English (1991);

Besides he has written number of articles in Law, Philosophy and literature. He was also staunch nationalist and played a key role in the Indian Independence movement.

ADDRESS, LECTURES, ETC DELIVERED BY SIR ASUTOSH MOOKERJEE :

- Annual Address delivered at the Asiatic Society of Bengal. [In JASB & Proceedings] (1905) & New series V.2 (1906); [Calcutta, Printed at the Baptist Mission Press (1906);
- Reprinted from and Proceedings Asiatic Society of Bengal (New series) V.2 no. 2 (1906); [JASB & proceedings] (1907) New weries V.4. (1908); [In Society's Journal & proceedings (1908), New series 5 (1909); Calcutta, Printed at the Baptist Mission Press (1910);
- Reprinted from and Proceedings Asiatic Society of Bengal (New series) V.2 no. 2 (1906); Reprinted from and Proceedings Asiatic Soceity of Bengal (New series) V.6 no. 2 (1910);

- [In Society's Journal & Proceedings, New series (1911) & In Calcutta, printed at Baptist Mission Press (1913)].
- Reprinted from and Proceedings Asiatic Society of Bengal (New series) V.9 no. 2 (1913);
- The History of the Indian Museum, an inaugural address delivered on November 28, 1913, in the Muscum Lecture Hall, Calcutta
- Calcutta printed at the Baptist Mission Press (1915);
- Reprinted from and Proceedings Asiatic Society of Bengal (New series) V.11 no. 2 (1915); [JASB & proceedings, Asiatic Society of Bengal (New series) V.18 (1922) & Printed at the Baptist Mission Press, Calcutta (1923);
- Democratic Control of Universities - A lecture at the Lucknow University Union, January 8 (1924);
- Ccnvocation Addresses [In Calcutta University as Vice-Chancellor : 1907-1921];
- Address as Second Oriental Conference; 28th January, 1922, Calcutta University Press;
- Convocation Addresses [In Calcutta University as Vice-Chancellor; 1923];
- "The University and the Nation"--Address at the convocation of the Lucknow University, 7th January (1924).

HONOURS AND AWARDS ACHIEVED BY SIR ASUTORH MOOKERJEE :

- Member of London Mathematical Soceity, first time from India (1884);
- Fellow of Royal Astromical Society, England & Member of Royal Society of Edinburgh (1885);
- Fellow of Royal Society of Edinburgh; Member of Royal Asiatic Soceity, Great Britain; Member of Bedford Association for Improvement of Geometrical Teaching, Engnald (1886);
- Fellow of London Physical Society, England (1887);
- Fellow of Mathematical Society of Edinburgh & Fellow of Mathematical Society of Paris (1888);
- Member of Mathematical Society of Patermo, Sicily, Italy & Member of Science de Physique of France (1890);
- Member of Irish soceity of Sciences, Ireland (1893);
- Fellow of American Mathematical Society (1900);
- President of Asiatic Society of Bengal (1907-1909);
- D.Sc. (Honoris Causa) from Calcutta University, Founder President, Calcutta Mathematical Society & President, Indian association of Cultivation of Science (1908);

- ❖ President of Board of Trusties for Indian Museum (1909);
- ❖ President of National Library (formerly Imperial Library Council) (1910-1924) and President of Bibudha Jnani Pandit Sabha, Nabadwip; President of Calcutta Sanskrit Association; Title of 'Saraswati' from the Pandits of Nabadwip; President, Bangiya Dharmankar Buddha Sabha and President, Mahabodhi Society (1910-1924);
- ❖ Knighthood from British Government (1911);
- ❖ Title of 'Shastra Vachaspati' from Dhaka Saraswati Samaj (1912);
- ❖ Founder-President, Indian Science Congress Association and Title of 'Sambuddhagama Chakravarty' from Mahabodhi Society, Cylone (1914);
- ❖ First President of National Science Congress (1914);
- ❖ Title of 'Vidyarnava' from the Mysore citizens (1916);
- ❖ Title of 'Bharat Martanda' (1920).

Sir Asutosh Mookerjee was basically a man, great academician, mathematician, educationist, vibrant social worker, great patriot, eminent judge with illustrious career, towering pesonality, high self-respect, courage and a high level administrative ability. In a word Asutosh Mookerjee was the most dynamic figure in Indian education and its true builder to whom the country will always remain indebted "It is our misfortune that he had to leave the world of mathematics at the prime time of mathematical research for practice of law and afterwards, for acting as an administrator in Calcutta University". In the year 25th May, 1924, in Patna at the age of 59, Asutosh Mookerjee passed away to the next world.

LITERATURES CONSULTED :

1. Barik. A. and R. Dhara, 2921. Outlooks of Sir Ashutosh Mukhopadhyay on the field of education. IERT. 7(1); 47-49.
2. Mandal. J. H. and T. Halder. 2018. Contribution of Ashutosh Mukhopadhyay as a reformer of Calcutta University. JETIR. S(12). 884-888.
3. Mukhopadhyay. U., 2014 (June); Sir Ashutosh Mukherjee; A mathematician par excellence, DRE.AM 2047, Vol. 16 (9); pp 34-32, Vigyan Prasar.
4. Nath. R. 2013 (January). Centenary Session of Indian Science Congress, DREAM-2047, Vol-15 (4); pp 25, Vigyan Prasar.
5. Sar. S. 2016 (January); Ashutosh Mukhopadhyay; Mathematical Genius with the magic wand. pp 1-152. Publisher; Jnan Bichitra. Dr. K. B. Street, Kolkata-700 009.

--:::::::--

বাংলার সম্পদ কীর্তন

রমেশচন্দ্র মাইতি
(সংগীতজ্ঞ ও গবেষক)

কীর্তন হল একটি বিশেষ গীতরীতি। শ্রীলরূপ গোস্বামী বলেছেন, ''নামগুণলীলামুচ্চৈর্ভাসা তু কীর্তনম্'', অর্থাৎ উচ্চস্বরে শ্রীভগবানের নাম, গুণলীলা ইত্যাদি কথনের নাম 'কীর্তন'। শুকদেব ভগবানের লীলাদি বর্ণনা করতেন কথকতার ভিতর দিয়ে, আবার দেবর্ষি নারদ বীণা বাজিয়ে হরিনাম গান করতেন। তাই সুর-তাল ছাড়া যে লীলাদির বর্ণনা, তার নাম হলো 'শুক্‌কীর্তন'। আর সুর-তাল সহযোগে যে লীলাগান, তার নাম 'নারদকীর্তন'।

শ্রীভগবানের লীলা ইত্যাদি নিয়ে যেকোন গানকে কিন্তু কীর্তন বলা হয় না। কারণ, রাধাকৃষ্ণ কিংবা অন্যান্য দেবদেবীর বিষয় নিয়ে বহু ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরী ও ভজন ইত্যাদি রচিত হয়েছে। প্রত্যেকটির গীতরীতি ভিন্ন। যেমন, ধ্রুপদ ধামারে বিভিন্ন লয়কারী থাকে। খেয়ালে থাকে আলাপ, বিস্তার, তান, বাঁট ইত্যাদি। ঠুংরীতে গলার বিভিন্ন কারুকাজ, আর ভজনে থাকে আবেগভরা নিবেদিত প্রাণ, যাতে মানুষ আত্মস্থ বা বিমোহিত হয়। কীর্তনের সংজ্ঞা বলতে গেলে বলতে হয়—নরোত্তম দাস, শ্রীনিবাসাচার্য, জ্ঞানদাস প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনদের দ্বারা প্রবর্তিত বিশিষ্ট গীতরীতিযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ বিষয়ক যে গান খোল-করতাল সহযোগে গাওয়া হয় তাকে 'কীর্তন' বলা হয়।

প্রাচীনগ্রন্থে শুক্‌কীর্তন ও নারদকীর্তনে এই দু'টি ধারার বর্ণনা পাওয়া গেলেও আবার সংকীর্তন ও কীর্তন শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীহরির নামগানকে সংকীর্তন ও লীলা কীর্তনকে শুধু কীর্তন বলা হয়। প্রথমটি সংঘবদ্ধভাবে গীত হয় এবং দ্বিতীয়টি একজন মুখ্য গায়কের দ্বারা গীত ও অনুচর দ্বারা অনুগীত বা পুনর্গীত হয়ে থাকে। প্রথমটিতে সকলের অবাধ অধিকার, আর দ্বিতীয়টি যাঁরা একান্তভাবে 'ভুবিভাবুকা' কেবল তাঁদের জন্য। তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেছেন—

অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস আস্বাদন,
বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্তন।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পুণ্য আবির্ভাবের ফলে তিনি যেমন লুপ্ত বৃন্দাবনের আবিষ্কার করেছেন, তেমনি বিশুদ্ধ ব্রজধামে প্রবেশের দিব্যসাধন মহাসংকীর্তন এনে দিয়েছেন এবং জীবের দ্বারে দ্বারেও বিলিয়েছেন। তাই নরোত্তম দাস বলেছেন—

গোলকের প্রেমধন
হরিনাম সংকীর্তন.....

প্রাক্ চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব সাধকগণ যে সমস্ত কাব্যগান রচনা করেছেন—তা হলো 'পদাবলী কীর্তন'। তার মধ্যে জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখ মহাজনদের পদাবলী নিয়ে প্রবর্তিত হয় 'লীলাকীর্তন'। শ্রীকৃষ্ণের লীলাগানের এক একটি বিষয়বস্তু বা ঘটনা নিয়ে রচিত হয় 'পালা' বা 'পর্যায়'। যেমন—মান, মাথুর, নৌকাবিলাস, গোষ্ঠ ইত্যাদি। উচ্চাঙ্গকীর্তন এবং লীলাকীর্তনের আগে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার প্রচলন করেন নরোত্তম দাস। গৌরচন্দ্রিকা হলো কীর্তনগানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে লীলা বর্ণনা করা হয় তার আগে ওই রস অনুযায়ী শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্র বিষয়ে যে গান গাওয়া হয় তাকে 'গৌরচন্দ্রিকা' বলে।

বাংলাদেশে কীর্তনগানকে জনপ্রিয় ও নিয়মবদ্ধরূপ দান করেছিলেন বৈষ্ণবাচার্য নরোত্তম দাস (দত্ত)। তিনি ছিলেন চৈতন্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। শুধু পদকর্তা হিসেবে নন, বঙ্গদেশে স্তিমিত প্রায় বৈষ্ণব ধর্মকে যাঁরা পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নরোত্তম দাস অন্যতম। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী জেলার খেতুরী গ্রামে বিখ্যাত এক জমিদার বংশে নরোত্তম দাস (দত্ত) জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ষোল বছর বয়সে গৃহত্যাগী হয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। সেখানে গিয়ে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং জীব গোস্বামীর কাছে ভক্তি

শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন। সঙ্গীত সাধন শুরু করেন সেই বৃন্দাবনে। এরপর তিনি খেতুরীতে ফিরে সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন শুরু করেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় খেতুরীর রাজা সন্তোষ দত্ত ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে গৌরচন্দ্রিকাসহ দোলপূর্ণিমায় দশদিনব্যাপী মহোৎসব ও সেইসঙ্গে কীর্তনগানের আয়োজন করেন। গোকুলানন্দ দাস (গায়ক), গৌরাঙ্গ দাস ও দেবীদাস (বাদক) প্রভৃতির সহায়তায় নরোত্তম দাস যে নতুন ঢঙের কীর্তন গানের প্রবর্তন করেছিলেন তাকে পরগণার নামানুসারে—'গড়েরহাটি কীর্তন' বা 'গরাণহাটি কীর্তন' বলা হয়। এই ঘরাণার একটি পদ একটি তালেই গাওয়া হয়, তা বিলম্বিত, মধ্য বা দ্রুতলয় যাইহোক না কেন, খুব অল্প আঁখর দ্বারা মূলপদের ভাব প্রকাশ করা হত—সহজ সরল সুরের সাহায্যে। নরোত্তমের সহকারীরা গীতবাদ্য শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন পুরীর শ্রীস্বরূপ দামোদরের কাছে। এছাড়া আরো কয়েকটি পদ্ধতির প্রচলন পাওয়া যায়, যেমন—মনোহরশাহী, রেনেটি, মন্দারিনী, ঝাড়খণ্ডী ও ঢপ্।

মনোহরশাহী ঃ

'গড়েরহাটা' বা 'গরাণহাটী' ঢঙের অনুকরণে জ্ঞানদাস ও নৃসিংহনন্দ মিত্র ঠাকুর প্রমুখ কান্দ্রানামক স্থানে মিলিত হয়ে যে ঢঙ্-এর প্রবর্তন করেন তাকে বলা হয় 'মনোহরশাহী ঢঙ্'। অনেকে মনে করেন শ্রীখণ্ড কাটোয়া অঞ্চল মনোহরশাহী পরগণার অন্তর্গত। সেই অঞ্চলে বংশীবদন ঠাকুর এবং আউলিয়া মনোহর দাস এই ঘরানার প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। মনোহর দাসের নামানুসারে এই পদ্ধতি মূলত খেয়াল অঙ্গের, লয়-ছন্দ ইত্যাদি কিছুটা সংক্ষিপ্ত সুরের কারিকুরি ও মাত্রার জটিলতায় এই কীর্তন সমৃদ্ধ।

রেনেটি ঃ

বর্ধমান জেলার রানিহাটী বা রেণেটি গ্রামের সন্নিকটে দেবীপুরের বিপ্রদাস ঘোষ এই ঘরানার প্রবর্তক। গ্রাম বা পরগণার নামানুসারে এই ঘরানার নামকরণ বলে মনে করা হয়। আবার অনেকে মনে করেন শ্যামানন্দ যিনি গৌড়উৎকলা নামে বিখ্যাত। তিনি এই পদ্ধতির প্রবর্তক। টপ্পার গঠন ভঙ্গিমার সাথে রেণেটি পদ্ধতির যথেষ্ট মিল রয়েছে। তাই এর মাধুর্য ও সৌন্দর্য খুবই উল্লেখযোগ্য।

মন্দারিণী ঃ

কবি গোকুলানন্দ ঝাড়খণ্ডি এই পদ্ধতির প্রবর্তক। দেখা যায় যে, কীর্তনে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভাব পূর্বযুগে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু থেকে থেকে এর প্রভাব কমতে শুরু করে এবং আঙ্গিকের দিক থেকেও অনেকাংশে সহজ হয়ে যায়। তখন আরও বেশি পরিমাণে সাধারণের সঙ্গীত পিপাসা মেটাবার জন্য কীর্তনে আরো সহজরূপের প্রকাশ ঘটে।

ঢপ্‌কীর্তন ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর এক লৌকিক গানের গায়ক রূপচাঁদ পক্ষী যিনি বাউল, পাঁচালী ও পদকীর্তনের সংমিশ্রণে প্রবর্তন করেন 'ঢপ্‌কীর্তন'। সমগ্র রাঢ় দেশে তাঁর ঢপ্‌কীর্তন খুব সমাদৃত হয়। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, ঐ সময় একদিকে বাঙালির চিন্তা-চেতনা অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পরিণতির যুগ, আবার অপরদিকে নব সূর্যোদয়ের রক্তিম আভাস। ঐ সময় কবিগান, খেউর, আখড়াই, হাফ্ আখড়াই প্রভৃতির প্রচলন প্রভূতভাবে ঘটেছিল। তখন কিন্তু কীর্তন এইসব কিছুর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধুসূদন কিন্নর বা মধূকান ঢপ্‌কীর্তনের নবরূপ দান করেন। তাতে পাঁচালী, বাউল প্রভৃতি লৌকিক সুরের ও ছন্দের পটুত্ব বা প্রভাব যেমন ছিল তেমন অপরদিকে ছিল রাগসঙ্গীতের প্রয়োগ কৌশল। উপরিউক্ত সমস্ত ঘরানার পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তবে বর্তমান দুটি পদ্ধতির প্রচলন আছে। যেমন—ভারিক্কি চালের বাঁধাধরা সুরতালের অনুবর্তী মীড়বহুল অল্পতান বিশিষ্ট ভাবগম্ভীর কীর্তনগানকে বলা হয় ঘরোয়ানা ঢঙ্ বা বটুক্ ঢঙ্। আর জনসমাজে গাইবার উপযোগী, কথকতা (ঘটকালি), সুরের কারুকাজ ইত্যাদি মনোরঞ্জনকতাকে বলা হয় আসরের ঢঙ্ বা রঙ্-গান। উল্লিখিত প্রথটি হলো গরাণহাটি, আর দ্বিতীয় হলো মনোহরশাহী।

● কীর্তনের বৈশিষ্ট্য ●

কীর্তনগানে শুধু বৈষ্ণবসমাজ স্বীকৃত মহাজনদের পদাবলীই গাওয়া হয়। কারণ, বৈষ্ণবসমাজ মনে করেন পদ-রচয়িতা মহাজনেরা নিছক কবি নন। তাঁরা লীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। কাজেই গানে পদকর্তার নাম উচ্চারণ করার সময় গায়ক ও শ্রোতারা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করতেন। অবশ্য গায়কপরম্পরায় প্রচলিত এমন কিছু ছোট ছোট গান গাওয়া হয় যাতে পদকর্তার নাম নাই। এই গানগুলিকে 'তুক্‌গান' বা 'পল্লবগান' বলা হয়।

- কীর্তনে মূলপদের ভাবানুযায়ী ব্যাখ্যামূলক কিংবা রসপুষ্টিকারক অতিরিক্ত কথা সুর-তাল সহযোগে যে গান গাওয়া হয় তাকে আঁখর বা অলংকার বলা হয়।
- খোল-করতাল ছাড়া অন্য বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে বিজাতীয় ভাব আসতে পারে বলে গোঁড়া কীর্তন গায়কগণ তা পরিহার করে থাকেন।
- কীর্তনে একই গানে বিভিন্ন তাল ব্যবহার করা হয়, কখনও কখনও মন্থর করা হলে তালশাস্ত্রে তাকে বলা হয় 'যতি'। কীর্তনে সুর বা রাগের পরিবর্তন ও মিশ্রণ হয়ে থাকে।
- অন্যান্য গানের স্থায়ীর মত কীর্তনে প্রথম পদের পুনরাবৃত্তি হয় না। আঁখর বা কাটান পর্যায়ের শেষে পুনরায় উৎপত্তি স্থানে ফিরে আসতে হয়। এই ফিরে আসা ব্যাপারটিকে বলা হয় 'ঘরে যাওয়া'।
- মূলগানের এক একটি অংশ গাইবার পর দোঁহারগণ একসঙ্গে তার পুনরাবৃত্তি করেন। কোন বড়গান মূল গায়কের পর শুধু ডানদিকের প্রধান দোহার তা একা গান করেন।
- কীর্তনের ভাব ও রসপুষ্টি সাধনের জন্য তার সহায়ক সুর ও তালের ব্যবহার অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। যাতে তালের কলাকৌশল কথা ও ভাবের ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে।
- এছাড়াও কীর্তনের সুর ও রাগগুলি হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিনীর মত বা তার অনুগত নয়। শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ তা বিচার করা গভীর গবেষণা সাপেক্ষ। কীর্তনের তাল-পদ্ধতি অন্যান্য তাল-পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। তবে তা পুরোপুরি তালশাস্ত্রের অনুসারী।

● কীর্তনে ব্যবহৃত পরিভাষা ●

পালা বা পর্যায় ঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাগানের এক একটি বিষয়বস্তুর (Plot) নাম 'পালা' বা 'পর্যায়'। যেমন— মান, মাথুর, নৌকাবিলাস, গোষ্ঠ ইত্যাদি।

ভণিতা ঃ বৈষ্ণব পদাবলীর কোন গানের শেষ পদে পদকর্তা অর্থাৎ কবির নাম যুক্ত থাকে। সেই কবির নামযুক্ত অংশকে বলা হয় 'ভণিতা'। পদকর্তাগণ অধিকাংশ সখীভাবের সাধক। আবার কোন কোন পদে দাস্যভাবের ভণিতাও আছে, যথা—

(সখীভাব) ''চন্দ্রশেখরে কহে অনুচিত মান।
রোখে তেজলি কাহে নাগর কান।''
(দাস্যভাব) ''যাদবেন্দ্র সঙ্গে লইও বাধা পানই তারে দিও
বুঝিয়া যোগাবে রাঙা পায়।''

কাটান ঃ কোন পদের যতটুকু একবার গাওয়া হয়, তার মাঝখানে কোথাও ছেদ করে আঁখর বা মূলগানের কথা ভিন্ন স্বর বিন্যাসে যুক্ত করলে তাকে বলা হয় 'কাটান'। ১ × ২ × ইত্যাদি দ্বারা কাটান চিহ্নিত করা হয়।

আঁখর ঃ কীর্তনের মূল গানের সাথে গায়ক যে সমস্ত ব্যাখ্যামূলক ও রসপুষ্টিকারক অতিরিক্ত কথা সুর ও তাল সংযুক্ত করেন তাকে 'আঁখর' বা 'অলংকার' বলে। সুর-তাল ছাড়া শুধু কথার বিন্যাস ও তার পিছনে আঁখর যোগ করলে তাকে বলে 'ঘটকালি'।

লয় বা লওয়া ঃ কীর্তন গানে যে ছন্দ-নির্দেশক-বোল দ্বারা প্রাথমিক সঙ্গত করা হয় অর্থাৎ তবলায় যাকে বলা হয়

'ঠেকা', কীর্তনে তার নাম 'লয়' বা 'লওয়া'।

মাতন ঃ যখন দোহারগণ উচ্চকণ্ঠে সমবেতভাবে একই কাটান বা আঁখরকে বার বার আবৃত্তি করেন এবং সজোরে খোল-করতাল-বাদ্য চলতে থাকে তাকে বলা হয় 'মাতন'।

মূর্ছন ঃ মাতন বা গান শেষ করার জন্য বাদক যে বোলের প্রয়োগ করেন তাকে 'মূর্ছন' বলে। মূর্ছনের সঙ্গে সঙ্গে গায়কদের মূলপদে ফিরে আসতে হয়, তাকে বলে 'ঘরে যাওয়া'। ঘরে যাওয়ার সময় শেষ ২/৩টি মাত্রা মন্থর হয়ে আসে। গায়ক বাদকগণ মূর্ছন বলতে পরিসমাপ্তির স্থানকে বুঝান এবং ওই বোলকে বলেন 'পরণ'। সঙ্গীত দামোদরে নাম ছন্দম্। ('বাদ্যং বিমুচ্যতে যেন ছন্দনং তন্নিগদ্যতে')

দাগীগান ঃ যে গানের সুর ও তাল পরম্পরাক্রমে কোন বিশেষ সুর-তালে বাঁধাধরা নিয়মে চলে আসছে তাকে 'দাগীগান' বলে। দাগীগান যথেচ্ছভাবে গাওয়া দোষের।

কলা ঃ কলা বলতে কীর্তন গায়কেরা তালের এক একটি আবৃত্তিকে বা ওয়ার্দা বা আবর্তনকে 'কলা' বলে থাকেন।

ছুট্ ঃ কোন বড় তালে গান আরম্ভ করে পরে অপেক্ষাকৃত লঘু তালে গানের যে অংশ গাওয়া হয় তাকে বলা হয় 'ছুট্'। কেউ কেউ তালের ছুটাকে 'ছুট্' বলে।

তুক্ ঃ ছোট ছোট ভণিতাশূন্য যে পদ গায়কপরম্পরায় চলে আসছে তাকে 'তুক্' বা 'পল্লব' গান বলে। পালা মিলাবার জন্য বা বর্ণনীয় বিষয়ের মাঝে সূত্র গাঁথবার জন্য প্রাচীন গায়কেরা এগুলির প্রচলন করেছিলেন।

গৌরচন্দ্রিকা ঃ রাধাকৃষ্ণের যে লীলা বর্ণনা কীর্তনে গাওয়া হয়, ঠিক তার পূর্বে ঐ রস অনুযায়ী শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্র বিষয়ক যে গান গাওয়া হয় তাকে 'গৌরচন্দ্রিকা' বলে। পালার পূর্বে তদুচিত গৌরচন্দ্র বলে সেই পদ নির্দেশ করা হয়। গৌরচন্দ্রিকা কয়েক রকমের হতে দেখা যায়—

যাতে গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণভাবে আবিষ্ট;
যাতে গৌরচন্দ্র শ্রীরাধাভাবে আবিষ্ট;
যাতে নাগরীভাবে ভজনাকারীর শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ব ভাব বা উক্তি আছে;
যাতে শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ে ভক্ত ও অনুগামীদের উক্তি আছে।

বৈষ্ণবদের বিশ্বাস শ্রীরাধার ভাব কান্তি নিয়ে তাঁড়র ভাব আস্বাদনের জন্য বা তাঁর প্রেমের ঋণ পরিশোধের জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নদীয়ায় এসেছেন। গৌরচন্দ্র রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। ব্রজের হরির সবাই নানারূপে এসেছেন।

সুবল এসেছেন গৌরীদাস রূপে;
শ্রীদাম এসেছেন অভিরাম রূপে;
ললিতা এসেছেন রামানন্দ রূপে;
বিশাখা এসেছেন স্বরূপ দামোদর রূপে;
শ্রীরাধা এসেছেন (যখন গৌরচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণভাব) গদাধর রূপে।

শ্রীরূপ ভাব নিয়েই রচিত হয়েছে গৌরচন্দ্রিকা।

বাঙালির বহু সাধের ধন এই কীর্তন আজ অনাদ্রিত ও উপেক্ষিত। হয়তো মানুষের জীবনের গতিবেগ আজ এমন দ্রুততর হয়ে উঠেছে যে, ধীর বা মন্থর গতির কোনো গীতরীতিকে কর্ণপাত করার মত অবকাশ বা ধৈর্য্য আজ কারোর জন্য অবশিষ্ট নেই। মানুষ আজ আর লীলাবিলাসে কালক্ষেপ না করে অর্থলালসায় সতত ব্যস্ত। তাই হয়তো আমরা আজ কীর্তনকে ভুলতে বসেছি কিন্তু একটা ধুয়া বা কলি মৃদঙ্গের মধুর আওয়াজে আমাদের প্রাণের তন্ত্রীতে যেমন এক আশ্চর্য ঝংকার তোলে, তেমনি হৃদয়কে করে উদ্বেল, নয়নকে করে অশ্রুসজল। কারণ, কীর্তন যে আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত এবং জীবনের সাথে একান্তভাবে জড়িত। কীর্তনের মধ্যেই তো বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়। কীর্তনই তো বঙ্গদেশের ও বাঙালি জাতির হৃদ্‌স্পন্দন। কীর্তন স্তব্ধ হয়ে গেলে বাঙালির নিজস্ব জাতির আত্মপরিচয়ের অবসান ঘটবে, অথচ সেই অবসানের দিকেই আমরা দ্রুততরভাবে এগিয়ে চলেছি। কীর্তনকে আজ

আর গুরুমুখী বিদ্যা বলে আটকে রাখলে চলবে না। অর্থাৎ দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সঙ্গে অভিজ্ঞ কীর্তনীয়ার পদপ্রান্তে বসে তা শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু আজ সে গুরুপরম্পরা বা সম্প্রদায় বিলুপ্তির পথে কাজেই বর্তমান যা অবশিষ্ট আছে তাকে যদি সংরক্ষণ না করা যায় তবে কীর্তনকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

কীর্তনকে সুরক্ষিত করা প্রসঙ্গে ১৯৬২ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী 'বাংলার কীর্তন' নামক (সংকলন ও স্বরলিপি) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—''অনেকে হয়তো কীর্তনগানকে স্বরলিপিতে ধরিয়া রাখিবার প্রয়াসকে একান্ত হাস্যাস্পদ ও বৃথা শ্রম মনে করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে অন্ততঃ মূল কাঠামোটি যে রক্ষিত হইবে তাহাতে সন্দেহের কারণ নেই। ঠিক ভঙ্গি বা গায়কী কোনদিনই স্বরলিপিগম্য নহে।''

কাজেই এক্ষেত্রে বলা যায় যে, রবীন্দ্র, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, ডি.এল. রায় প্রমুখের গীতসম্ভার স্বরলিপির মাধ্যমে যেভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছে, তেমনি কীর্তনকেও স্বরলিপির মাধ্যমে গুণী কীর্তনীয়াদের সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। নইলে আমরা আমাদের সম্পদকে হারাবো।

১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক বুদ্ধদেব রায় (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) মহাশয়ের সম্পাদনায় এবং সংকলন ও স্বরলিপিকার ব্রজরাখাল দাস (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) মহাশয়ের দ্বারা প্রকাশিত 'শ্রেষ্ঠ কীর্তন স্বরলিপি' পুস্তকাটি বাঙালির কীর্তন প্রীতির পিপাসা নিবৃত্তিতে কিছুটা হলেও সহায়ক হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র ঃ

১. বাঙালার কীর্তন—পরেশচন্দ্র মজুমদার।
২. বাঙ্‌লা গানের বিবর্তন—ড. উৎপলা গোস্বামী।
৩. শ্রেষ্ঠ কীর্তন স্বরলিপি—অধ্যাপক বুদ্ধদেব রায়।
৪. সঙ্গীততত্ত্ব (রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ)—দেবব্রত দত্ত।

——ঃঃ——

The Story of Omayra Sanche'z

Dr. Jyotirmoy Pandit
(Associate Professor, Department of Geography,
Ramnagar College, Purba Medinipur, W.B.)

It was 13th of November in the year 1995 when a girl named Omayra lived in the town of Armero in Columbia. She had her father, brother and her aunt in the family. Her mom worked in a hospital which was 160 km away from Armero. So, her mom visited her once in a fortnight. Her household situation was quite well, they were contended. It was the time to harvest their crops. On that appointed day, while harvesting, they could listen some eerie sounds. The sound was increasing. The time was 4 o'clock in the afternoon. As the sky was cloudy, the people thought it might be the sound of cloud thrashing. So, they decided to collect their crops as soon as possible and hurried back home. Omayra's house was a bi-level house which was decorated nicely by blossoms. It had a paddy warehouse. Omayra started to arrange the crops in the paddy storage place perfectly and delightfully so that no crops could be dissipated. As the time passed, the unearthly sound became ear-splitting. Anyway, the government or the nearby villagers disn't care. Now also they considered that, it was the sound of the cloud flourish.

Actually, the sound was of a bubbling and sizzling lava inside a Dormat volcano named Nevado Del Ruiz located side by the Armero town. The volcano woke up after 75 years. The government paid no attention to the matter. Its height was about 17500 feet. If somehow it bursts, its effect may reach nearly 100-200 km.

The time was now 9:30 in the night, the time for making dinner. As Omayra's mom was a nurse, her aunt had to run the household, feed the kids and teach them. Her aunt, Adela and she were making the dinner when the sound became blaring and clangourous. Now the people felt doubt about the sound. People in every house started to discuss about the matter. When the sound was intolerable and strident, more or less 5000 people came out of their house witth torches in their hands to see the matter around 200 km. The sound was really deafening. Hardly did they find the mystery than the volcano terribly and tremendously explosed. It was genuinely devastating. The people had their eyes in their jaws. As the volcano erupted, hot mud blew up went over people and houses all over. Thousands of torches were vanished. All shouts and cries went under the mudflow. Omayra and her aunt were on the first floor of their house so they glided along the mud all night. Her aunt held Omayra with her hands tightly with her mouth upwards so that she would not be drowned. They hovered nearly 78-100- km. She was bitterly frightened and lost her sense.

Twenty-four hours slipped by when it was raining cats and dogs there. Omayra winked and squinted her eyes to see the world clearly. There was mud everywhere as she looked. No trees, no houses, and no people but was bog all over. As she was peering around, she gradually recollected everything; about the situation, she went through. After some hours, the Red Cross approached near the location. The people of that organisation searched for any living species and started to shout loud although they knwe it was impossbible so stay alive after this uncertain disaster. After so much of yelling they almost gave up when a quiet sound astonished them. It was Omayra, the girl, who cried out 'help! help! I am still alive'. No sooner did they hear the sound than the people stared ransacking the whole area searching for the continuous pleading sound. After so much of exploring, they found little Omayra at last. They were acridly shocked after seeing her. They thought could anybody be breathing after this undetermined calamity. They gave Omayra food and water. The people then tried to take her out from the filth. At first, they gave her an air fight tube from which she got support and triumph to show her whole face. After so much of dragging, she abled to get up to her waist. But after much of pulling, they cannot succeed to take out her legs from the ooze. The little chica cried of pain. The people tried hard; they even called some cranes for tugging her but it was quite impossible. In the wake of much decisions, two international scuba divers are called. They were said to go under the thick mud and survey the matter. Listening them, the scuba divers swam into the sludge and investigated. As they glanced the view of the scenery inside, they were totally dumbfounded. They saw a woman (the kiddie's aunt) was holding Omayra's legs with both of her hands firmly and a concrete beam had been fallen on Omayra's legs. Her both legs had been smashed from the knee section. As they came off, they suggested to keep a strong branch of tree on the edge of the mud to hold herself from getting soaked into the silt. Many huge sacks were kept around her so that she would not be dipped inside the gumbo.

Some renowned doctors were being called at the mark. They were informed by the Red Cross people about the whole background inside. The Red Cross people also suggested the doctors to cut off her legs and draw her out from the clag. But the physicians told that she would die of GANGRENE within six hours if the operation is to be carried out inside the mud. The people felt extremely depressed and regretful as they had to wait for the kiddo's natural death.

A journalist was being seated beside her. He name was Maria. She sat day and night by the side of Omayra, talking to her, passing jokes and so on. Omayra shared the beautiful songs that she had learnt in her school with Maria. In this way, sixty-two hours passed but nothing mattered her. She was strong enough to handle her. In this process of staying together, Maria, the journalist, took various interviews from Omayra

and shared all over the world. Soon after journalists from all over the world came and interviewed her. She explained how the ignorance of Columbian Government resulted a destructive cataclysem. Slowly Maria and Omayra became best of friends. Maria was her ideal companion. She told her about her secrets. Now it was the third day, Maria still sedentary beside her. The time was 9:30 or 10:00 in the morning when Omayra, the little bimbo demanded to eat some chips and soft drinks. Maria made those bought from faraway about 160 km away from the place because she knew that it was her last wise before death. Maria are them cheerfully and thanked her profusely. On the very next day, all of a sudden, she started to talk like any wrong fool, she bellowed to go to school, to get escape from the heavy thick mud. She also screamed that she wanted to do her maths home task provided by her teacher at school. She even cried out for her father, brother and aunt and wondered where they are. Gradually, her hands and face had turned in brown colour. Her white pale skin was slowly turning into dark brown. Her hands became white in colour and looked like fluffy cotton. Her eyes were swollen and turned red. Blood clotted inside her eyes as well as inside her whole body. She looked extremely terrible. She was breathing faster than usual. She looked very horrifying then. She was telling Maria to help her come out from that filth. The child had gotten to know that she was dying. The way she was asking for help was really dreadful. Maria pulled her but was unable to help her. It was indeed impossible. Her hands were shaking. She tried with all her power to emerge herself outwards but it ws quite hopeless. Maria burst into tears. Omayra requested Maria and other members present there to help her come up for the last time. Maria with all her might haulted her upwards but it seemed out of the question. Omayra breathed her last breath and went inside the mud. Her nose and one of two eyes were only visible from outside which looked horrible. Maria broke down and felt angry with the Columbian nonsence government. She took a last photo of Omayra and shared all over the world to show how stupid and careless the Columbian government was. Years after years it had been thought that Omayra was still alive and that exact spot was her area. She was the queen of that region. After a ruinous calamity, she was still alive for four days.

Later, in 2020 scientists discovered a new species of *jhijhipoka* on that area. The species was named as *Gigagrilas Omayral* to show our respect to the little chica of Columbia. Being an insect, she still cries "where are you padre? Where are you tia? I'am sinking."

--::::::::::::::--

গ্রাম নামের আড়ালে ইতিহাসের খোঁজ

তপনকুমার রণজিৎ
(ইতিহাস গবেষক ও লেখক)

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানা বাংলার বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া বিরল ও ব্যতিক্রমী জমিদারি নোনাড়ি'র ভূঞ্যা জমিদার বংশ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে হলদিয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শেষ গ্রাম নোনাড়ি (মৌজা-নোনাড়ি, জে.এল.নং-০৪১)। দক্ষিণে গ্রাম-কিয়াকুইলি, উত্তরে রানিসাই। ওপারে ভোগরাইয়ের গ্রাম গণেশ্বরপুর। দক্ষিণে কিশোরপুর, উত্তরে সুখসণ্ডা। দেউলিহাট-মীরগোদা রাস্তা উত্তরমুখী হওয়া-মাত্র পূর্বদিকে রয়ে গেল গঞ্জেশ্বর শিবমন্দির—অতীতের 'মন্দির থানা'। পশ্চিমে কিয়াকুইলি-মুকুন্দপুর রাস্তা ছুটে চলেছে আরো পশ্চিমে। রাস্তার বামদিকে দোতলা-তিনতলা বাড়ির সমান বালির পাহাড়ের উপর পানের বরোজ—বয়সের প্রমাণপত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকত। বালুমাটির স্নিগ্ধতা পেরিয়ে কংক্রীটের রুক্ষতা। পানচাষী চাষ ছেড়ে পূর্বপুরুষের তিল তিল করে সঞ্চিত ক্ষেতিভূমির বালি বেচে বানিয়েছে ছোটোখাটো ইমারত, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করেছে বাদবাকি অর্থ। প্রাচীন রাস্তাঘাটের নিশানা, চিহ্ন ধুয়ে মুছে সাফ। শাখা রাস্তা উত্তরমুখী হওয়া মাত্র শুরু নোনাড়ি গ্রাম। দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়ে গেল গ্রাম কিয়াকুইলি। উত্তরমুখে পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তীর্ণ প্রান্তর সবুজে সবুজ হয়ে উঠেছে শরতের গর্ভবতী ধান্যসুন্দরী। শাখা রাস্তা ভেঙে পূর্বমুখী প্রশাখা রাস্তার কোল ঘেঁষে ছোট্ট কুঁড়েঘরে নব্বই ছুঁই ছুঁই বৃদ্ধার উৎসুক চাউনি। ভূঞ্যাবাড়ি যাওয়ার রাস্তা?—'ঘটি ডোবে না, তবুও ভূঞ্যা জমিদার বলে কথা'—চঞ্চলমতি বৃদ্ধার তর্জনী নির্দেশিত পথে নির্দিষ্ট হল নোনাড়ি'র 'ভূঞ্যাগড়'। আজও কান পাতলে জনশ্রুতির হৃদ্‌স্পন্দন প্রতিধ্বনিত হয় সীমারেখার উভয়ধার বরাবর।

আদিকথা

অতীতের বীরকুলখণ্ডের (রামনগর-ভোগরাই) ক্ষেত্রসমীক্ষায় 'বালিসাই ভূঞ্যাগড়', 'গড়ভৌরি ভূঞ্যাগড়' এবং 'নোনাড়ি ভূঞ্যাগড়'-এর ভূঞ্যা উপাধিধারী তিন আদি জমিদার বংশের কথা জানা যায়—কেবলমাত্র নোনাড়ি'র ভূঞ্যা জমিদারের আদি বাসভূমি হল নোনাড়ি, লৌকিক ভাষায় (মালঝিটা) নুনাড়ি। নোনাড়ি—এই স্থান নামেই লুকিয়ে আছে প্রাচীনত্ব ও মহত্ত্ব। সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলার স্থাননাম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ''ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় গোপচন্দ্র বিজয় সেনের অনুশাসনে তেরোটি স্থাননাম পাওয়া যায়। বেশির ভাগ বাটিক বা বাটক যুক্ত। যেমন—নুনাড়ি < লবণ বাটক?'' এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যায়, সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্কের সমসাময়িক মহারাজ গোপচন্দ্রের তাম্রলিপিটিতে (জয়রামপুর / কিরাতগড়, ভোগরাই) পরিষ্কারভাবে নুনাড়ি নাম উল্লেখিত। এটি খুঁজে পেয়েছেন সত্যনারায়ণ রাজগুরু ('ওড়িশার সাংস্কৃতিক ইতিহাস')। নুনা আড়ি স্থাননামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি মহাশয়, ''কোলীয় ওড়াঃক্'—দেওয়াল, প্রাচীর। 'আড়ি'—উঁচু ভূমির আড়াল, শিকারের জন্য লুকিয়ে থাকার জায়গা। গ্রামবসতি গড়ার প্রাথমিক স্তরে পাথর সাজিয়ে বা মাটির দেওয়াল দিয়ে গ্রামকে সুরক্ষিত করা হতো। সিংভূমের মুণ্ডা বসতি—প্রধান গ্রামে এখনো এই রীতি বর্তমান। মেদিনীপুরে 'অড়া' বা 'আড়া' দেওয়ার অর্থ বাড়ি তৈরির জন্য ভিত বাঁধা। তামিলী ভাষায় 'ওয়াড়া'—সুরক্ষিত গৃহ। কোলীয় উৎসে শব্দটির প্রাথমিক অর্থ ছিল—দেওয়াল, পরিবর্তিত অর্থ—প্রাচীর ঘেরা গ্রাম। বিস্তারিত অর্থ—সাধারণভাবে গ্রাম। ক্ষুদ্রার্থক 'ই' প্রত্যয়ঃ নুনা আড়ি। ('মেদিনীপুরের স্থাননাম এবং' পৃষ্ঠা ২৮-২৯)।'' স্থাননামের ইতিবৃত্ত থেকে সহজেই অনুমেয় নোনাড়ি নামে স্থানটির উৎপত্তি ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে। নবম শতাব্দী নাগাদ নোনাড়ি গ্রামকে কেন্দ্র করে লবণ কারবার ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। রায়বংশ লবণ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে লক্ষ্মীর কৃপায় গড়ে তুলেছিলেন ছোট্ট মাপের এক জমিদারি।

উপকূলীয় ভাগে খণ্ডায়েতদের নেতা ঝিনি নায়ক লবণ উৎপাদনকারী মলঙ্গী প্রজাদের ঐক্যবদ্ধ করে উড়িষ্যার

গঙ্গবংশীয় রাজার বিরুদ্ধে সামিল হয়। রাজাকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ সহ লবণ রপ্তানির কর্তৃত্ব নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। এদের উপদ্রবে প্রায় সমগ্র মালঝিটা দণ্ডপাঠের জনজাতি তটস্থ হয়ে উঠেছিল। গঙ্গরাজ অনন্ত চোড়গঙ্গ (১০৭৮-১১৪২ খ্রিঃ)-এর আদেশক্রমে কটকের সামন্তরাজা বালিবিশি পরগণার বিশ্বনাথ দাসকে বীরকুলখণ্ডে পাঠান। জাতিতে করণ রায়বংশের আদিপুরুষ বাণিজ্যিক স্বার্থের কথা ভেবে স্বজাতি বিশ্বনাথের সঙ্গে হাত মেলান। সহজেই ঝিনি নায়ক পরাজিত হয়। উৎকলাধিপতি কর্তৃক বিশ্বনাথ 'বুধিশক' উপাধিতে ভূষিত হন এবং বালিসাই জমিদারি স্বত্ব লাভ করেন। অন্যদিকে সাহায্যের প্রতিদানে নোনাড়ি'র রায়বংশের আদিপুরুষের 'ভূঞ্যা' উপাধি সহ নিষ্কর জমিদারি ভূমিস্বত্ব জোটে।

গড়কথা

বীরকুলখণ্ডের প্রাচীন এই জমিদার বংশের বয়স এক হাজার বছরেরও অধিক হলেও ধারাবাহিক কুলখ্যান পত্রের দেখা মেলা ভার। ক্ষেত্রসমীক্ষায় কেবল ছয়-সাত পুরুষের নাম পাওয়া গেল। সংখ্যার বিচারে তা ২৩০-২৫০ বছরের অধিক নয়। আদিপুরুষ ছিলেন ভূঞ্যা দুর্গাচরণ দাসমহাপাত্র রায়বাহাদুর—নামের আগে পরে উপাধি'র বহর দেখেই বোঝা যায় প্রভাব প্রতিপত্তি বিষয় বৈভবের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এক সফল জমিদার। নোনাড়ি'র ভূঞ্যাগড় ভিতরগড় ও বাহিরগড়-এ বিভক্ত। ভিতরগড় উঁচু বালুকাস্তূপের উপর অবস্থিত। মাঝে এক বড়ো মাপের পুকুর। সামনে ও পেছনে মাঝারি মাপের দুটি পুকুর বর্তমান। ছিল শক্ত মাটির প্রাচীর। প্রাচীরের বাহিরে তিন দিক গড়খাই দ্বারা বেষ্টিত, কিন্তু তা আজ বাস্তুজমিতে পরিণত। গজিয়ে উঠেছে তিন-চারটি শরিকানা বসত বাটি। পুরোনো গড়ের ভগ্নাবশেষ-এর চুন-সুরকি, ইটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চত্বর জুড়ে। তার উপর গড়ে উঠেছে চার-পাঁচটি নতুন নতুন আবাস। ছিল রাসমঞ্চ সহ নানা দেবালয়। বর্তমানে পূর্বমুখী সাধারণ মানের ভগ্ন এক দুর্গামণ্ডপে ছোট্ট মাপের মৃন্ময়ী ও তাঁর সংসারের মূর্তি গড়ার কাজ চলছে। মন্দিরের গর্ভগৃহের দরজা খুলতেই দেখা দিলেন কুলদেবতা রঘুনাথ ও শালগ্রাম শিলা। পাশেই বড়ো মাপের কাঠের সিন্দুক। সিন্দুক খুলতেই বেরিয়ে এল বড়ো মাপের তিন-তিনটি মরচে পড়া লোহার যুদ্ধাস্ত্র (তলোয়ার)। পাখোয়াজের কাঠামো। নানা বাদ্যযন্ত্রের খণ্ডাংশ। ছিল বড়ো মাপের আভিজাত্যের রোশনাই—ঝাড়লণ্ঠন। কয়েকমাস আগে ঠিকানা হারিয়ে ফেরিওয়ালার কাঁধে জায়গা করে নিয়েছে। ভিতরগড়ের বাহিরে ছিল পশ্চিমদুয়ারী নাট্যশালা। উৎসব অনুষ্ঠানের দিনগুলি ছাড়াও আত্মীয়-স্বজনদের আগমনে নাচ, গান সহ বিভিন্ন মঙ্গলগান, পালাগান, যাত্রার আসরে রায় জমিদারির অঙ্গণ জমজমাট হয়ে উঠত। গ্রামের উপকণ্ঠে ধোপা, ডোম ও 'লগদি'-দের নিষ্কর জায়গির ভূঞ্যা জমিদার দান করেছিলেন। আজও তারা পুরুষানুক্রমে বাস করে আসছেন। গ্রামে ৭৫ শতাংশ পরিবার 'করণ' সম্প্রদায়ের বাস। তবে 'ব্রাহ্মণ' ও 'নাপিত' পরিবার অনুপস্থিত। এই দুই সম্প্রদায়সহ অন্যান্য নবশাখ শ্রেণি বাহিরগড়-এ সীমান্তের ওপারে গণেশ্বরপুর গ্রামে জায়গির পেয়েছিলেন।

জমিদারবাড়ির ব্যবহৃত পাখোয়াজ

নোনাড়ি ভূঞ্যাজমিদারের ভগ্ন দুর্গামন্দির

সিন্দুকে প্রাপ্ত তিন লোহার তলোয়ার

জমিদারি কথা

মারাঠা আক্রমণকালে ভূঞ্যা জমিদারির গুরুত্ব বাড়তে থাকে মূলত লবণ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে। জমিদারি এলাকা সীমান্তের ওপার এবং নোনাড়ি ছাড়াও বৃদ্ধি পায় শোনপুর, নানকা, গোবডাঙ, অশ্বত্থপুর, রানিসাই, কিয়াকুইলি, দীঘা ও জাতিমাটি সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। নোনাড়ি জমিদারি'র শ্রীবৃদ্ধি সাক্ষ্য দেয়—বালিসাই'র তেইশতম ভূঞ্যা জমিদার নীলকণ্ঠ পুত্র গজেন্দ্র-এর সঙ্গে এই পরিবারের মেয়ের শুভ পরিণত বার্তা। নোনাড়ি ও শোনপুরে ছিল কাছারিবাড়ি। নায়েব, খাজনা আদায়কারী, লগদি সেনা সহ নানা কর্মচারির উপস্থিতি আভিজাত্যের সাক্ষ্য বহন করে। ১৮০৩ খ্রিঃ ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে পরাজিত মারাঠাশক্তি ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু নোনাড়ি'র জমিদারি করের আওতার বাহিরে থাকে। এমনকি ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে 'হিজলি সল্ট এজেন্ট'-এর এক্তিয়ারের বাহিরে থেকে যায় এই জমিদারির লবণ উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বীরকুল, কাখড়া, ভোগরাইতে তৈরি লবণ নোনাড়ি'র পথে বেশি দামে বিক্রি হতো দাঁতনের বাজারে। কোম্পানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতি হাটবারে, জমিদারি গড়ে বসত নাচ-গানের আসর। ইংরেজ সরকার সুকৌশলে নোনাড়ি'র জমিদারকে হাতে রাখতে 'রায়বাহাদুর' উপাধি প্রদান করে। এই জমিদারবংশের জমিদারি ধাপে ধাপে সরকারের সঙ্গে ভূমিবন্দোবস্তে বাধ্য হয় এবং মীরগোদা পরগণায় অন্তর্ভুক্তি ঘটে। হাতছাড়া হয়ে যায় একের পর এক লবণ উৎপাদন ক্ষেত্র। বন্ধ হয়ে যায় পারিবারিক লবণ ব্যবসা। আভিজাত্যের পাশাপাশি 'বাবু কালচার'-এর প্রভাবে বিক্রি হতে থাকে একের পর এক জমিদারি অংশ। সময় মতো রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে জাতিমাটি, পালষগুপুর, গদাধরপুর, ভগীব্রহ্মপুর গ্রামের জমিদারি অংশ কিনে নেন হুগলী জেলা থেকে আগত জনৈক অনিরুদ্ধ আদকের উত্তরপুরুষগণ। বর্তমান নিবাস চাঁপাবনী। এই বংশের বর্তমান প্রজন্ম সব্যসাচী আদক মহাশয় খুঁজে পেয়েছেন ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ব্যবহৃত এক শিলমোহর এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের দলিলের ছেঁড়া এক টুকরো। এই অংশে লেখা হয়েছে মহামহিম শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ রায়, ঁদুর্গাচরণ রায়বাহাদুর-এর পুত্র জাতি-হিন্দু (করণ); পেশা-অংশটি কেটে গেছে। সাং-নুনাড়ি; পঃ-মীরগোদা; জেলা-মেদিনীপুর। থানা ও সা. রেজিস্ট্রী-রামনগর। বামদিকে স্বাক্ষর; তাং-১৬/০৪/১৭। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে শিলমোহরের ছাপে স্পষ্ট—'শ্রী শ্রীকৃষ্ণপদ আদক এবং শ্রী ক্ষেত্রমোহন আদক। সাং-চাম্পাবনী, পং-মীরগোদা। এই শিলমোহর মূলত কৃষকের কাছ থেকে খাজনা প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি।

১৯১৯ সালে ব্যবহৃত স্ট্যাম্প

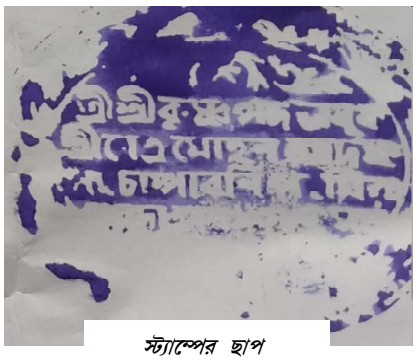

স্ট্যাম্পের ছাপ

জমিদার রাধাকৃষ্ণ রায়ের উত্তরপুরুষ গজেন্দ্র ও গদাধরের আমল থেকে অর্থাভাবে জমিদারির রাশ আলগা হয়ে যায়। জমিদারবাড়ির কর্মচারীরা একে একে বিদায় নেয়। বেশির ভাগ জায়গির প্রাপ্ত প্রজারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কম মূল্যে জমিদারের কাছ থেকে জমি কিনে নেয়। এই জমিদার বংশের দান-ধ্যান, স্কুল বা প্রতিষ্ঠান গড়ার তেমন নজির নেই। তবে অশ্বত্থপুর গ্রামে পানীয় জলের সংকট মেটাতে জমিদার খুঁড়েছিলেন এক পুকুর, যা 'ভূঞ্যানিপুকুর' নামে খ্যাত। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে কোনো যোগ ছিল না এই বংশের। জমিদারি হারিয়ে গেলেও জনমানসে সেদিনের আতঙ্ক আজও শোনা যায়—'জমিদারের বাস্তুতে জুতো পায়ে বা ছাতা মাথায় সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। জমিদার ভূপেন্দ্রনাথ এবং দেবেন্দ্রনাথ রায়ের আমল পর্যন্ত জমিদারি কোনোক্রমে টিকে ছিল। ১৯৫৩ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির ঘোষণা হলে প্রায় সমস্ত জমি খুব কম দামে বিক্রি হয়ে যায়। এই পরিবারের রক্তে মিশে গিয়েছিল গান-বাজনা। বিষ্ণুপুর, পঁচেটগড়সহ বালেশ্বর ও মেদিনীপুরের নামীদামী সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে বসত গান-বাজনার

আসর। শেষ জমিদার ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন বিখ্যাত 'তবলিয়া'। তখন এই বাদ্যযন্ত্রটিকে দেখার জন্য ভিড় করত স্থানীয় বহু উৎসাহী বাদ্যকার। ১৯৫৫ সালে জমিদারি ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপ বিলুপ্ত হয়। বৃদ্ধ ভূপেন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন প্রতি বছর দুর্গাপূজার চার দিন যাত্রাপালা গানসহ নানা উৎসব অনুষ্ঠানে গমগম করত জমিদারবাড়ি। গানের শিল্পী হিসেবে ডাক পড়ত স্থানীয় উদীয়মান সঙ্গীত শিল্পীদের। সেদিনের এক সঙ্গীতশিল্পী রমেশচন্দ্র মাইতি মহাশয় আজ ৮২ বছরের ঋষিতুল্য সঙ্গীত সাধক। তিনি সর্বপ্রথম নোনাড়ি'র ভূঞ্যা জমিদারির সঙ্গীতপ্রীতির কথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। নোনাড়ির রায় বংশের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বালিসাই ভূঞ্যাগড়ের (দাসমহাপাত্র), নেগুয়ার (মহাপাত্র), এগরার (মহাপাত্র), ভোগরাই দাউদপুরের (মহাপাত্র), ভোগরাই কালেহির (মহাপাত্র), দেউলার (মহাপাত্র), মুকুন্দপুরের (মাইতি), শোনপুরের (মাইতি), কানপুরের (মাইতি), চাউলখোলার (দাস), কণিওড়ার (মাইতি) প্রভৃতির বর্ধিষ্ণু পরিবারের সঙ্গে। নোনাড়ি গ্রামের সঙ্গে উপকূলীয় গ্রাম অলংকারপুরের বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা বন্ধন কবে থেকে শুরু কেউ জানে না, তবে এই বন্ধন সূত্র আজও বিদ্যমান। ব্যতিক্রম একটাই পাত্রী-নোনাড়ি'র, পাত্র-অলংকারপুরের। অর্থাৎ অলংকারপুর গ্রামের শ্বশুরবাড়ি বা মামাবাড়ি নোনাড়ি। এই সূত্র কেবলমাত্র 'করণ' সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ।

অতীতের ভূঞ্যা উপাধিধারী জমিদার বংশ আজ ভূমিহীন জমিদার হয়ে দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করছে। কান পাতলে শোনা যায় 'বেচারাম জমিদার'-দের করুণ কাহিনী। গড়বাড়ির বসতবাটি অংশটুকুও দেবোত্তর। বিক্রির উপায় নেই। লগদিদের উত্তরপুরুষ গড়বাড়ির বাস্তুতে গড়েছে অট্টালিকা। গরম নিশ্বাসে ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে হারিয়ে যাওয়া জমিদারির অন্দরমহল।

কূল-তালিকা

ভূঞ্যা দুর্গাচরণ দাসমহাপাত্র রায়বাহাদুর
↓
রাধাকৃষ্ণ
↓

গজেন্দ্র	গদাধর
↓	↓
ভূপেন্দ্রনাথ	দেবেন্দ্রনাথ
↓	↓
জয়নারায়ণ	লক্ষ্মীনারায়ণ
↓	↓
শুভেন্দু	দিলীপ

তথ্যসূত্র ঃ ১। মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু।
২। বাংলার স্থাননাম—সুকুমার সেন।
৩। ওড়িশার সাংস্কৃতিক ইতিহাস (ওড়িয়া)—সত্যনারায়ণ রাজগুরু।
৪। মেদিনীপুরের স্থাননাম এবং—বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি।
৫। বীরকুলে বীরগাথা (রামনগর । দীঘা । ভোগরাই)—তপন কুমার রণজিৎ।

সাক্ষাৎকার ঃ ১। শুভেন্দু রায় (নোনাড়ি, রামনগর)।
২। দিলীপ রায় (নোনাড়ি, রামনগর)।
৩। রবীন্দ্রনাথ দাস (নোনাড়ি, রামনগর)।
৪। রমেশচন্দ্র মাইতি (ঘন্টশোলা, রামনগর)।
৫। সব্যসাচী আদক (নিউ দীঘা, রামনগর)।

——ঃঃ——

স্মৃতির আঙিনায় বরেণ্য কবি জয়ন্ত মহাপাত্র

বরুণ কুমার দাস
(ইংরেজি বিভাগ, রামনগর কলেজ)

"পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হওয়ার জন্য আমি লেখা বা কবিতা নিয়ে কিছুই জানতাম না। বাস্তবে আমার পত্নী ছিল ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী। আমি যেহেতু ইংরেজীতে পড়াশোনা করেছিলাম, তাই আমি শব্দগুলোর যথার্থ প্রয়োগ করে লেখার সাহস সঞ্চয় করতে পারলাম। বেশ কিছু লিখেছি, গোটা পৃথিবী জুড়ে প্রকাশিতও হয়েছে, কিন্তু আমি জানি না কিভাবে আমি এই কাজটি করতে পারলাম।"

"আমি মনে করি, ওড়িশা-কে বাদ দিয়ে অন্য কোনও রাজ্যকে ভালোবেসেছি। আমার বিদেশে অবস্থান নিয়ে অনেক সুযোগ ছিল। যখন আমার বিশিষ্ট কবি বন্ধু এ কে রামানুজন, আর আর পার্থসারথি বিদেশে থেকে গেছেন, সেখানে আমি ওড়িশা ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি ভালোবেসেছি আমার রাজ্যের আবহাওয়া, তার বাতাস, আর তার বৃষ্টিকে। এই ৯৪ বছর বয়সেও আমার বৃষ্টিতে ভিজতে ভালো লাগে। আজকেও আমি বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম।"

একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক্। সময়টা ইংরেজি ২০১৩ সাল। রামনগর কলেজের ইংরেজি বিভাগ ও এগরার শারদা শশীভূষণ কলেজ-এর যৌথ প্রচেষ্টা ও ইউ জি সি-র সহযোগিতায় একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয় ইং-১৩ আর ১৪ই মে। সেই সেমিনারের মধ্যমণি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি জয়ন্ত মহাপাত্র। ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক অধ্যাপক এবং রিসার্চ স্কলারদের আগমন হয় এই অনুষ্ঠানে। রামনগর কলেজের মতন একটি গ্রাম্য কলেজে এই ধরনের একজন বিশিষ্ট কবির আগমনকে অনেকে ব্যঙ্গ করে, অনেকের মনে অবিশ্বাস জন্মায়, কেউ মেনে নিতে পারে না যে তিনি আদপেই এখানে আসতে পারবেন। কিন্তু সবার পরিহাস, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ এবং আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে তিনি কিন্তু এখানে উপস্থিত হন। সাদরে কবিকে পুষ্পস্তবক আর চন্দন দিয়ে বরণ করে নেয় রামনগর কলেজ। কলেজের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যক্ষ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক স্বাগতে অভিভূত হন কবি। কবির খুব ভালো লাগে এখানকার পরিবেশ এবং অতিথি অভ্যর্থনা। বরেণ্য কবিকে নিজের বাসভবন কটক শহরের তিনকণিয়া বাগিচা থেকে গাড়িযোগে আমি সঙ্গে নিয়ে আসি কলেজে। দীর্ঘ যাত্রাপথে অনেক কথা হয়, অনেক অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করি। সেদিনের সেই কথাগুলো আমার কাছে চিরকালই সম্পদ হয়ে থাকবে। ভদ্রকে চা-পান, বালেশ্বরে টিফিন। সঙ্গে ছিলাম আমি আর সেদিনের মূল্যবান প্রহর। সন্ধ্যা নাগাদ দিঘায় পৌঁছাই আমরা। হোটেলে কবিকে রাখার সবকিছুই ব্যবস্থা ছিল ইংরেজি বিভাগের তরফ থেকে। সবদিক দিয়েই যাতে কবির কোন সমস্যা না হয় নজর দেওয়া ছিল এবং সমস্ত ব্যবস্থাপনা যথার্থ করার চেষ্টা ছিল। রামনগর কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনন্ত মোহন মিশ্র, ইংরেজি বিভাগীয় প্রধান ড. সুতনু কুমার মহাপাত্র সমেত বিভাগের অধ্যাপক সত্যসুন্দর সামন্ত ও বিশ্বজিৎ করের অকুণ্ঠ প্রচেষ্টায় সেদিন সেমিনার অনন্য মাত্রা পেয়েছিল। কবি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেই খুব আনন্দ লাভ করেন। বিশেষভাবে আয়োজিত প্রশ্ন-উত্তর আসরেও কবি উপস্থিত সমস্ত গুণীজনের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর যথার্থভাবে দেন। সবার সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা এবং সম্পর্ক স্থাপন করেন। খুব কাছ থেকে কবিতে দেখতে পাওয়া এবং খুব কাছ থেকে কবির সান্নিধ্য পাওয়া ছিল সৌভাগ্যের ব্যাপার। সবাই বরেণ্য কবির উপস্থিতি মন ভরে উপভোগ করেছিলেন সেদিন। জয়ন্ত মহাপাত্রের খুব ভালো লেগেছিল এখানকার ঘরোয়া পরিবেশ, আপ্যায়ন ও আন্তরিকতা। সমস্ত অনুষ্ঠানটির আগাগোড়া ভিডিও রেকর্ডিং করার ব্যবস্থা ছিল। রামনগর কলেজের আপ্যায়ণ এতটাই কবিকে প্রভাবিত করেছিল—কবি আবার একবার আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, কিন্তু বিভিন্ন কারণে

সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেটা অপূর্ণ থেকে গেছে, অপূর্ণ থেকে গেল চিরদিনের জন্য। এই সেমিনার আয়োজন-এর প্রচ্ছদে বেশকিছু কথা আছে আমি আজকে সেগুলো কিছুটা সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চাই। অনুষ্ঠানের পূর্বে কটকে আমরা গিয়েছিলাম—আমি এবং ডক্টর সুধীর কুমার মহাপাত্র কবি জয়ন্ত মহাপাত্রের বাসভবনে। নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে আমরা কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আলোচনা হয়, মতের বিনিময় হয়—সে অভিজ্ঞতা অবর্ণনীয়, কোনদিন ভোলা যাবে না। কবিকে খুব কাছ থেকে দেখেই মনে হল তিনি খুব কাছের ঘরের মানুষ। এত বড় একজন কবি সামান্যটুকুও অহমিকা বোধ ছিল না। তিনি ছিলেন মাটির মানুষ। কটক ছিল বর্ণপরিচয়। তাই সাধারণ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা ইস্তাহার কবিতার শব্দে শব্দে ভরেছিল।

এক নজরে কবি.....

জন্ম ২২ অক্টোবর, ১৯২৮, কটক শহরের পিটন সাহি। বাবা স্যামুয়েল মহাপাত্র, মা সুধাংশুবালা দাস। পত্নীর নাম রুনু (জ্যোৎস্না) মহাপাত্র এবং একমাত্র পুত্রের নাম মোহন মহাপাত্র। প্রথমে স্টুয়ার্ট স্কুল, পরে বিভেন্সা কলেজ, তার পরে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে এম.এস.সি। সহ-সম্পাদকভাবে দ্য ইস্টার্ণ টাইমস্ দিয়ে শুরু, পরে রেভেন্সা, ফকিরমোহন কলেজ, গঙ্গাধর মেহের কলেজ, বি জে বি কলেজ এবং শেষে রিভেনসা থেকে অধ্যাপনা জীবন থেকে অবসর নেন ১৯৮৬ সালে।

প্রকশিত পুস্তক ঃ

ক্লোজ টু স্কাই টেন বাই টেন (১৯৭১), এ রেন অফ রাইটস (১৯৭৬), ওয়েটিং (১৯৭৯), দা ফলস্ স্টার্ট (১৯৮০), রিলেশনশিপ (১৯৮০), লাইভ সাইন্স (১৯৮০), হুয়াইটনেস অফ বন (১৯৯২), বে আরর ফেস (২০০০), দ্য রেন্ডম ডিসেন্ট (২০০৫), ল্যাণ্ড (২০১০), হেসিটান লাইট (২০১৬), স্কাই উইদাউট স্কাই ঃ দ্য পুরী পোয়েমস্ (২০১৮)।

অনুবাদ ঃ

উইংস অফ পাস্ট (১৯৭৬), সংস্ অফ কব্জা এণ্ড আদার পোয়েমস্ (১৯৮১), আই ক্যান বাই হুয়াই সুড আই গো (শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ), নতুন দিল্লি (১৯৯৪), তপস্বিনী ঃ এ পোয়েম্ (১৯৯৮)।

পুরস্কার ঃ

দেশ-বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠিত সংস্থা, পত্র-পত্রিকা বিশিষ্ট কবিকে সম্মানিত করেছে। লন্ডন, শিকাগো, জাপান থেকেও তিনি বিভিন্ন পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন হাজার। ১৯৮১-তে নিজের কাব্যগ্রন্থ 'রিলেশনশিপ'-এর জন্য পেয়েছেন কেন্দ্র সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার এবং পরবর্তী সময়ে সম্মানজনক পদ্মশ্রী পুরস্কার থেকে শুরু করে ওড়িশার এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন এবং পুরস্কার লাভ করেছেন।

কবির কিছু প্রিয় অভিব্যক্তি এখানে তুলে ধরছি.....

প্রিয় রং—আকাশের রং।

প্রিয় মানুষ—মাধুরী থেকে মহাত্মা গান্ধী।

প্রিয় ঋতু—বর্ষা।

প্রিয় কবি—সেরকম বিশেষ কিছু নেই ও টুকিটাকি আর কি!

প্রিয় কবি ও কবিতা—বাবলু নেরুসা এবং তার কবিতা।

কিভাবে মৃত্যুবরণ করতে চান—হঠাৎ এই তোমার সঙ্গেই কথা বলতে বলতে বা কবিতা পড়তে পড়তে।

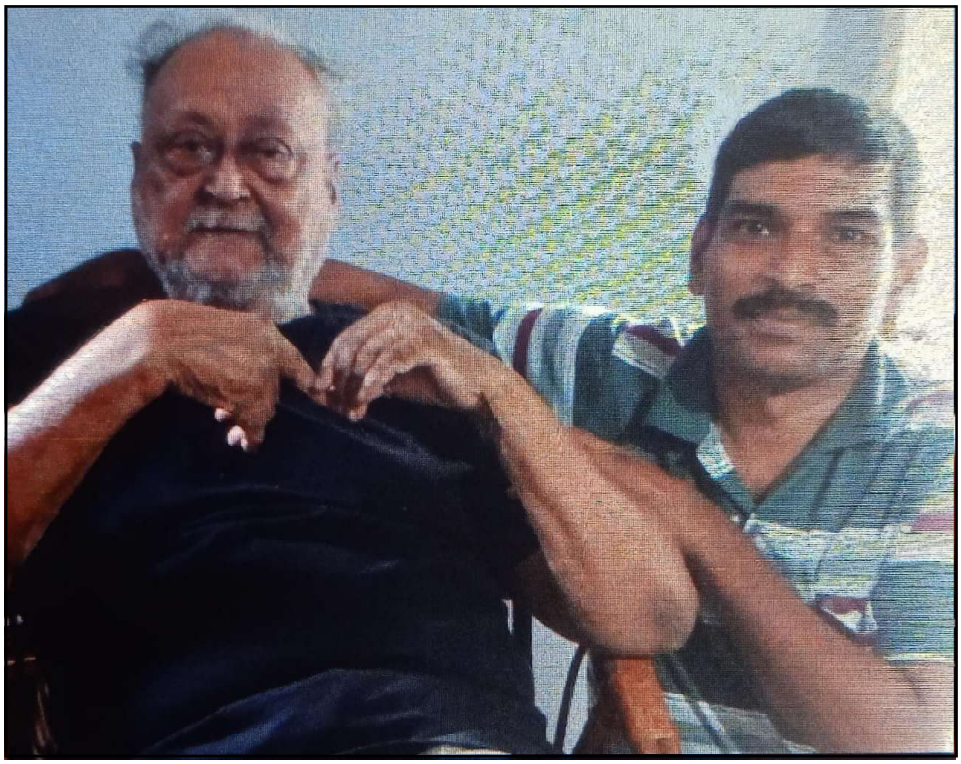

JAYANTA MAHAPATRA

Final Instructions to be followed after my death

to

Dev Kumar Das (Bulow), my nephew and nearest
male relation living at this time.
the 20th June 2023

That my body, after being washed, is to be attired
in white panjabi and pyjamas, and laid out in
an appropriate place (my room perhaps, or whatever
is decided by Bulow). His would be the final say
in all matters related to my funeral.

My body must not be taken anywhere (like an
exhibit), not to Ravenshaw University or to Sailabala
Womens College, where I taught.

Later, my body should be cremated, and not buried
in the Christian graveyard. No coffin should be made
for this purpose. Dipak Samantarai should take charge
of the cremation at Khan Nagar Electric Crematorium; an ambulance to
carry my body to Khan Nagar.

→ 2

Tinkonia Bagicha, Cuttack 753 001, Odisha, India | Chandrabhāgā a selection of Indian Writing

JAYANTA MAHAPATRA
TINKONIA BAGICHA CUTTACK 753 001 ORISSA

To
The Vice Chancellor
Fakir Mohan University, Balasore, Odisha

Cuttack, the 5th April 2013

Sir:
I'd be thankful if you kindly permit
Shri Barun Kumar Das
of Ramnagar College
to go through my books/articles/manuscripts
you have kindly accomodated in the Jayanta
Mahapatra Heritage Gallery of your library.

Thanking you
Yours faithfully
Jayanta Mahapatra

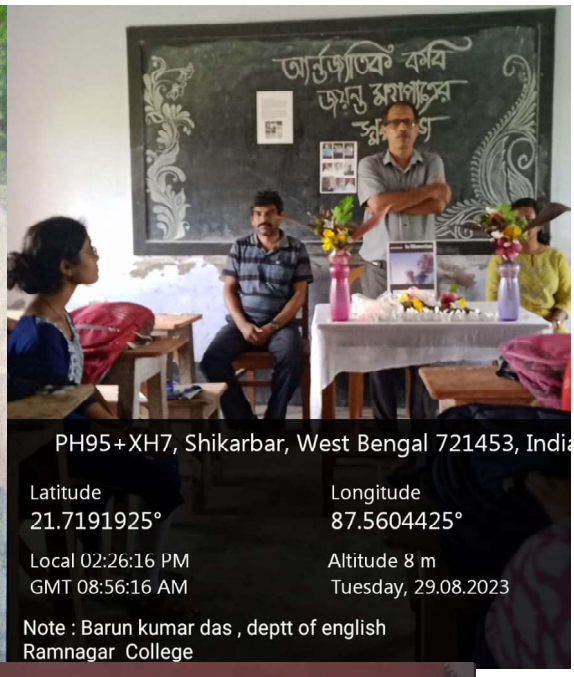
PH95+XH7, Shikarbar, West Bengal 721453, Indi
Latitude
21.7191925°
Longitude
87.5604425°
Local 02:26:16 PM
GMT 08:56:16 AM
Altitude 8 m
Tuesday, 29.08.2023
Note : Barun kumar das , deptt of english
Ramnagar College

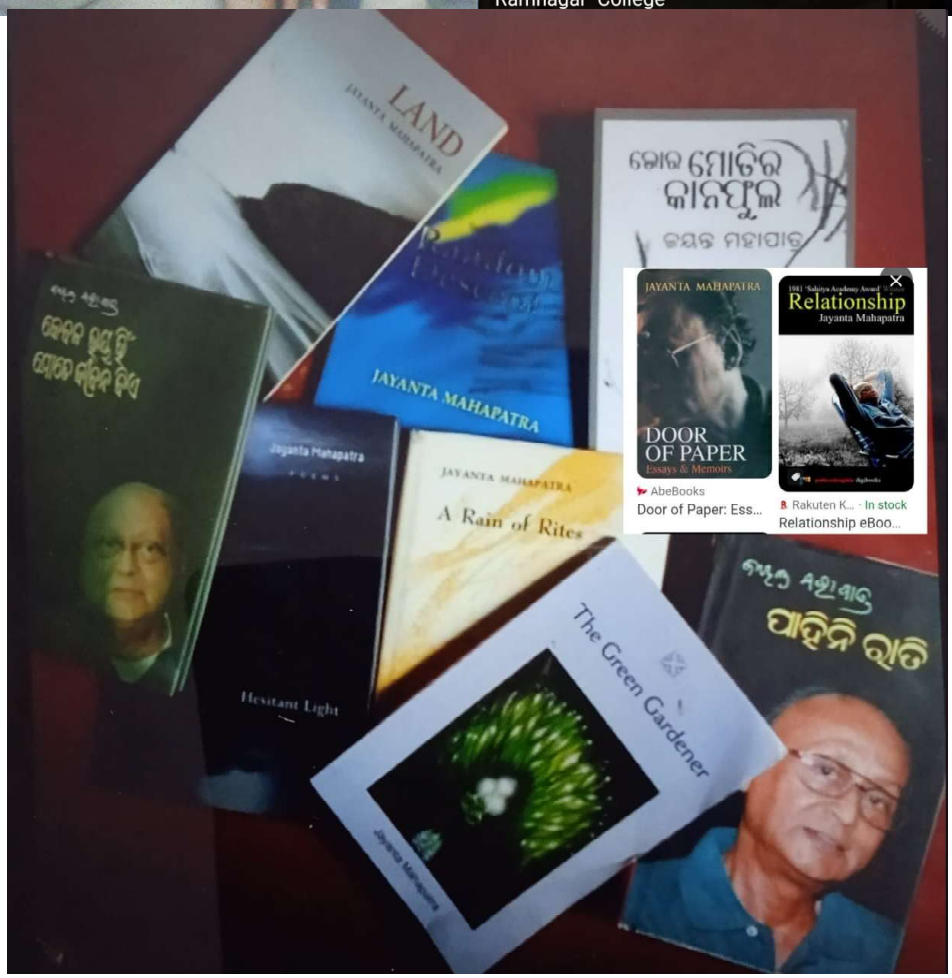
LAND
JAYANTA MAHAPATRA
JAYANTA MAHAPATRA
JAYANTA MAHAPATRA
DOOR OF PAPER
Essays & Memoirs
AbeBooks
Door of Paper: Ess...
Relationship
Jayanta Mahapatra
Rakuten K... · In stock
Relationship eBoo...
Jayanta Mahapatra
JAYANTA MAHAPATRA
A Rain of Rites
Hesitant Light
The Green Gardener

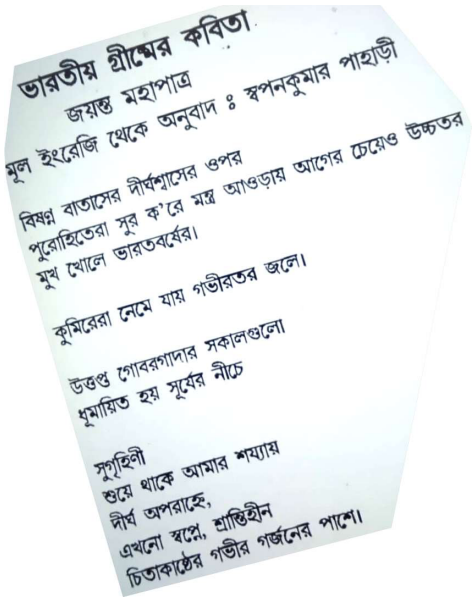

ছোট্ট মেয়েটার হাতটা অন্ধকারে মোড়া
আমি কিভাবে তার হাত ধরি?

রাস্তার বাতিটা ঝুলছে মাথার উপর আঘাতের মতো—
ভীষণভাবে রক্ত ঝরাচ্ছে আমার দু'জনের মধ্যে।

দেশের প্রশস্ত মুখের মধ্যে যন্ত্রণার বন্ধনী—
যদিও তার শরীরটা শুকনো দুঃখের জীবন।

ছোট্ট মেয়েটা যার পোশাকহীন দুমড়ানো শরীর আমার কাছে চলে আসে।

আমার দোষী শরীরটা অক্ষম হলেও পরাস্ত করে,
প্রতিরোধ করে তাকে আলিঙ্গণ করতে।

Freedom

*(Written by **Jayanta Mahapatra** - The most famous Indian poet)*
অনুবাদক ঃ মনোজিৎ দাস।

একটা সময় আমি লক্ষ্য করি
আমার দেশের শরীরটা
ভেসে চলে নদীর উপর নিরুদ্দেশে, আমাকে একা রেখে।
নদীর মধ্যে অর্দ্ধেক অবতীর্ণ
ডুবে থাকা বাঁশের উপর
আমি বাড়তে থাকি।

এখানে বিধবারা ও মৃতপ্রায় লোকেরা প্রার্থনা করে মুক্তির জন্যে—
দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে,
উপাসনায় অবিচল থাকে।
যদিও শিশুরা লালন-পালন হয় মুক্তির স্বাদকে আস্বাদন করতে, পৃথিবীর উপর হাত না রেখে।

এক এক সময় আমি ভয় পাই
আমার অন্ধত্বে—
আমি এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই,
ফিরে আসি ওদের সাথে
যখন ওদের মুখগুলোর কথা
মনে রাখতে পারি না—
তখন জীবনে একা হয়ে যাই।
ঐ সব মহিলা ও তাদের সন্তানদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি না।
যারা দূরের গ্রামে, পাহাড়ের নিচে বাস করে
দু'মুঠো অন্ন ওদের জোটে না
এক বেলা আহার জোটে না
পঞ্চাশ বছরের স্বাধীনতায়।
সংসদ কক্ষে সাদা স্তম্ভগুলি দাঁড়িয়ে আছে রক্তাক্ত সূর্যাস্তকে আঁকড়ে ধরে আছে।

কাছেই নতুন মন্দির—
একজন ব্রাহ্মণ,
সে শুধু চায় মুক্তি চায়
যদিও ভগবান লুকিয়ে আছেন অন্ধকারে।
প্রতিদিন আমি আলোর সন্ধান খুঁজি,
ছায়া শুধু অজুহাত দেখায়।
খোঁজার চেষ্টা করছি সেই মুক্তিকে,
যে সমগ্র শরীরকে মুক্তি দেবে
নরম শীলার নিঃশব্দ মুক্তি।
চাঁদহীন কয়লা
ঘুমন্ত ঈশ্বরের ঝর্ণার শয্যা।
আমি ছাইগুলোকে সরিয়ে রাখি, চেষ্টা করি না নিজের কপালে রাখতে।

Twillight

*(Written by **Jayanta Mahapatra**)*

অনুবাদক ঃ মনোজিৎ দাস।

হাসপাতালের বিবর্ণ ফলকগুলোতে,
কমলা রং বিস্তার হয়েছে
দিনাবসানের শেষ লগ্নে
যদিও অন্ধকার নামেনি।।

ছেলেমেয়েদের ভাষা
মায়ের মুখের মধ্যে
মৃত্যু, সেতো সবসময় যৌবনা
জলের কল্ কল্ শব্দ নদীর গলায়।।

এই কান্না কি ক্ষমা ভাগ করে নেওয়ার অভিশাপ?

কোথাও গোধূলির আলো পড়ে শুভ্র জুঁই ফুল ফোটার।।

রাস্তা ছাড়িয়ে বাড়িগুলোর উপর বাতি জ্বলে ওঠে,
আগষ্ট মাসের ভেজা সন্ধ্যায়
আমাকে জড়িয়ে রাখে—
আমার স্পর্শকাতর হাত দুটো
এক অজানা বিশালত্বের দিকে।

বরেণ্য কবি ধর্ম-ধারণা নিয়েও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। অস্তিত্ব নিয়ে ছিল লড়াই, বেদনা আর একাকিত্ব ছিল নিত্যসঙ্গী। কবি জীবনসঙ্গিনী রুনুকে হারিয়েছিলেন ২০০৮ সালে, একমাত্র ছেলের মৃত্যু ২০১৮ নাগাদ, আর কবি নিজে করোনায় আক্রান্ত হোন ২০২০-তে। সবকিছুর প্রতিফলন কবিতায় বিভিন্নভাবে রূপায়িত হয়েছে। বিশেষ করে কবির লেখা 'শেষ ইচ্ছাপত্র'—তাতে তিনি যে কথাগুলি বলেছেন সে বিষয়ে আমি যাচ্ছি না। কবির ধর্ম নিয়েও প্রশ্ন হয়েছে—হিন্দু না খ্রিস্টান। আবার ইংরেজিতে লিখতেন বলে সাধারণ পাঠক থেকে তৈরি হয়েছে দূরত্ব। তাই নিজে কবি জীবনের শেষের দিকে বেশ কিছু বছর অনেক কবিতা লিখেছেন ওড়িয়াতে। চেষ্টা করেছেন সাধারণ মানুষের খুব কাছে পৌঁছে যাওয়ার—যেহেতু ভাষাটা একটা বড় ভূমিকা রাখে। আমি মনে করি শেষের দিকে লেখা ওড়িয়া কবিতাগুলো যথারীতি আলাদা মাত্রা এবং বৈশিষ্ট্য বহন করে—কবিকে বোঝার ক্ষেত্রে। কবির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার প্রেক্ষাপটে জেনেছি কবি তামাম দুঃখ পেয়েছেন। কবির সার্থক মূল্যায়ণ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। নিজের ধর্মপত্নী যখন শেষ শয্যায় তিনি ভালো চিকিৎসা দেওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ করলেও আশানুরূপ সাহায্য পাননি বলে কবির ক্ষোভ আছে, অভিমান আছে বেশ কিছু মানুষজনের উদাসীনতার জন্য। ক্ষোভ আছে কবিকে একঘরে বা দূরে সরিয়ে রাখার জন্য। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ কবিকে যে মর্যাদা দিতে পেরেছে আমার মনে হয় আশানুরূপ কটক দিতে পারেনি। যে কটক ছিল কবির রচনার পটভূমি, কবির জীবনের সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে বিস্তার। বর্ণপরিচয়ের সময় ছিল কটক শহর। বালেশ্বরের প্রতি কবির টান চিরদিনের। বিশিষ্ট কবি শ্রীদেব থেকে এই প্রতিবেদক এবং বালেশ্বরে অবস্থিত ফকির মোহন বিশ্ববিদ্যালয় অবধি তা পরিব্যাপ্ত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির নামে নামাঙ্কিত একট আলাদা গ্যালারি আছে, যেখানে কবির সমস্ত বই, চিঠিপত্র এবং অন্যান্য জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখা আছে। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই কবি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার ভিতর দিয়ে যেতে থাকেন। শেষবার আমি

২০২১ সালের মাঝবরাবর সময় কবির বাসভবনে যাই। কবিকে খুব দুর্বল হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখি। আমাকে দেখে খানিকটা উঠে বসার চেষ্টা করে বলেন—'বরুণ দিন ভল যাউনি, কিছি মনে করনা, পরে আসিব কথা হেব'। এই অবস্থায় প্রণাম জানিয়ে পরিচারিকা আম্মার হাতে সংগে করে নিয়ে যাওয়া সামান্য কিছু দিয়ে ফিরে এলাম। দূরে সরে যেতে থাকে কবির প্রিয় বসতবাড়ি চান্দ্রভাগা, তিনকোণিয়া বাগিচা, কটক শহরের নিত্যদিনের শব্দমুখর ব্যস্ত জীবন। একাধিকবার ফোনের সমস্যার জন্য শেষের দিকে কবির সঙ্গে ঠিকমতন যোগাযোগ করে ওটা সম্ভব হয়নি। শেষ ল্যাণ্ডফোনে ওপার প্রান্ত থেকে কয়েকটি শব্দ, যা শুনতে পেয়েছিলাম জুলাই ২০২৩—'ফোনের কিছু শুনি পাইনি, পরে কথা হব'। এ প্রান্ত থেকে আমার কথা আর যেতে পারল না, আর কোনোদিনও যেতে পারবে না। এরপর যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও বার বার বিঘ্নিত হয়েছে বিভিন্ন কাজের নিরিখে। শেষ পর্যন্ত শেষবারের মতন আর কবির সঙ্গে দেখা সম্ভব হলো না। তিনি চলে গেলেন। কিন্তু কবি থেকে গেলেন—আমার মতন লক্ষ লক্ষ মুগ্ধ পাঠক-শুভানুধ্যায়ীর কাছে। কবি থেকে যাবেন চিরদিনের জন্য সবার হৃদয়ে আলাদা জায়গা করে।

ঋণ প্রাপ্তি ঃ

i) Express News Service 15 May, 2022.
ii) The Criterion An International Journal in English Vol. 3, issue 4, Dec 2012
iii) The Revati magazine, Balasore.
iv) The Shamuka sharadiya issue Oct, 1995.
v) The Frontline article.
vi) The chandrabhaga Whatsapp Group.
vii) Personal contact with the poet over 20 years.
viii) The Doinik Chetana Bengali Daily.
ix) Dr. Sutanu Kumar Mahapatra & Dr. DijendraNath Suine.
x) The Shreyashi online magazine ISSN 25814079.
xi) The prameya Odia Daily.

--:::::::::--

SHRIMP CULTURE IN WEST BENGAL : PAST, PRESENT AND FUTURE

Abhisek Jana[1] and Pijush Payra[2]

[1]Department of Fishery Sciences, Vidyasagar University, Midnapore, West Bengal, India
[2]Department of IFF, ACM and Fisheries Science (PG), Ramnagar College, Depal, Purba Medinipur, West Bengal, India.

Shrimp has emerged as an important item in the world seafood production. Asian countries like Taiwan, Indonesia, Thailand and India have emerged as global leaders in shrimp production. In order to bridge the gap between world demand and supply of shrimp, many countries have undertaken intensive shrimp farming with intensive applications of fertilizers and chemicals to boost the productivity. This intensified application in production had led to a spurt in production of shrimp till mid-nineties. But such production system has led to degradation of the resource base which resulted in the massive disease outbreak in the shrimp industry especially in 1995-96 and caused subsequent drop in the world shrimp production. Thus, sustainability of shrimp farming is emerging as a major policy concern in the context of further development of shrimp farming as a money spinner. The sustainability issues are intertwined with the environmental and social impacts of shrimp farming. The environmental impacts include conversion of mangrove area into shrimp ponds and consequent loss of the direct and indirect benefits from mangrove ecosystems, conversion of agricultural land, salinisation of the agricultural land, reduction in paddy production in areas where shrimp ponds are located, salinisation of nearby aquifers, deterioration of quality of groundwater and discharge of effcluents by shrimp farms to the nearby estuaries and rivers causing deterioration of quality of water both irrigation and potable in the surrounding locality.

Past Scenario :

From the last three decades, due to the high demand for shrimps in developed countries like North America, Europe and Japan large-scale shrimp farming has grown. For the significant of the global economy the earning from coastal shrimp culture affects a lot. Still, its adverse effects on biophysical environment and society have also attracted colossal attention which needed to be considered with utmost care. In our state *P. monodon* was largely cultivated up to the year 2012 and currently the shrimp farmers mainly depend on *L. vannamei.* As *P. monodon* was ignored by the farmers due to low stocking density and WSS (White spot syndrome) in their farming. But currently most of the shrimp farmers facing few detrimental diseases in *L. vannamei* among them WFS (White feces syndrome) is most important. Thus, we

predict that shrimp farmers may change their shrimp species or may adapt different farming system in near future.

Present Scenario :

A number of valuable findings which have far-reaching effect on the status of all the farmers as well as the overall development of the shrimp farming of West Bengal, India. Though the study of West Bengal only, the outcomes of the study have significance for the shrimp farming industry of the State of West Bengal as well as of India as a whole because the policies and programs for fishery development of the State and Central Governments are largely similar at the macro level. The study has come up with a very important finding that the largest number of fishermen across all the characteristics lack of believe on *P. monodon* due to its lower production rate, and lack of disease resistance strength. So, that's why they were shifted from monodon farming to *vannamei* farming. But now a major part of the farmers is aiming to culture *P. indicus* besides the *vannamei*. Significant information in this connection is the targeting culturable shrimp choices are depends on the market demands and low-cost high yield response.

Production rate of *P. monodon* in West Bengal

Sl. No.	Year	Culturable Area (Hectares)	Eastimated Production (Tonnes)
1.	2009-2010	47488	33685
2.	2010-2011	47588	40725
3.	2011-2012	48558	45999
4.	2012-2013	48410	52581
5.	2013-2014	48730	53049
6.	2014-2015	48848	53526.26
7.	2015-2016	50593	61998
8.	2016-2017	48474	44966
9.	2017-2018	51084	49319
10.	2018-2019	51455	47842
11.	2019-2020	51422	27585
12.	2020-2021	50000	19190

Source : https:/mpeda.gov.in/?page id=651

Production rate of *L. vannamei* in West Bengal

Sl. No.	Year	Culturable Area (Hectares)	Eastimated Production (Tonnes)
1.	2009-2010	0	0
2.	2010-2011	0	0
3.	2011-2012	0	0
4.	2012-2013	0	0
5.	2013-2014	130	479
6.	2014-2015	326	395
7.	2015-2016	1387	6776
8.	2016-2017	3657	26085
9.	2017-2018	4127	22191
10.	2018-2019	5096	29846
11.	2019-2020	6072	31376
12.	2020-2021	6059	35392

Source : https:/mpeda.gov.in/?page id=651

Future Scenario :

The coastal shrimp farms are protected by weak earthen bundhs often gets damaed by flood or even cyclonic disasters like Yass and Amphan influenced tidal waves which causes huge loss of shrimps by letting the excessive saline water and flood water into the ponds. It has also been observed that in most of the areas where shrimp farms are highly concentrated, there is no arrangement of sluice gates to control entry of saline water and in some places sluice gates remain out of order due to poor maintenance. These impediments are badly affecting the shrimp farmers to carry out farming activities smoothly.

Shrimp farming is playing a great role in present Indian economy. It has a big contribution to the economy of a developing country like India but is always subjected to some adverse environmental consequences. Survey conducted for the details of the shrimp farming in order to uplift the economic condition of the people in general and fishermen in particular. Results reveal that comparison of percentile formation on the past & present of shrimp farming, a total 55% farmers of the four experimental area, were presently cultured the *L. vannamei* shrimp, where total 6% farmers are engaged in the culture of *vannamei* as well as *monodon*. A total of 39% farmers are those who were shifted their farming from *P. monodon* to *L. vannamei*. In the present & future

comparison, where 57% farmers are engaged in *L. vannamei* culture in present situation, and 6% farmers involved in *vannamei & monodon* culture. In future, 13% farmers aiming to culture *P. indicus*, 13% targeting *P. monodon*, 6% wants to culture of both *L. vannamei & P. indicus*, 3% aiming both *vannamei & monodon* culture.

Export data indicates India achieved an all time high exports of seafood both in terms of volume and value by shipping 17,35,286 MT of seafood worth Rs. 63,969.13 crore (US$ 8.09 billion) during FY 2022-2023 despite the several challenges in its major export markets like USA. Frozen shrimp remained the major export item in terms of both quantity and value while USA and China turned out to be the major importers of India's seafood. Frozen shrimp, which earned Rs. 43,135.58 crore (US$ 5481.63 million), retained its position as the most significant item in the basket of seafood exports, accounting for a share of 40.98% in quantity and 67.72% of the total US$ earnings. Shrimp exports during the period increased by 1.01% in Rupee value.

--::::::::::--

"STUDY THE EFFECT OF WATER PARAMETERS ON *SCYLLA SERRATA* GROWTH AT PURBA MEDINIPUR IN WEST BENGAL"

Arup Kar

[(Correspondind & 1st Author), Fisheries Science, Ramnagar College)]

Sudip Mandal

[Master of Fisheries Science (Pursuing), SAGE University, Bhopal, M.P.]

ABSTRACT :

To a more basic degree more importance is additionally to manufacture to make the cradle as well as get business for the fishermen and waterfront affiliations. Common Mud Crabs are *Scylla serrata and Scylla tranquebarica* getting close charge to help, it makes most foolproof size of 1.5 kg, will not create any damage dam or shunting graph in lifestyles structure, mixed barrier, epidemic issues Less fragile, notable market pay, wider tolerance to temperture and harpness, and more specialized expansion into the commodity market as well as the local market. A lot of progress has been initiated by Research and Development for the processing and seed production of crabin the ocean front lakes.

Anyway, heaps of progress for union of new systems, institutional intervention for standardization amd commercialization of seed and feed levesl for culture development may not be possible at this point to approach real yield related to money if controls the fall and rise in temperature and sharpness in the fringe districts. Since temperature and turbidity and other water quality endpoints clearly affect feed limitation, the speed and assurance of crab flourishing. Nowadays these endpoints are no longer reliable as the dominant explanation of general changes in the environment.

KEY WORDS : *S. serrata,* Growth, Water parameters.

INTRODUCTION :

In the case of the crab encouraging the covering pots the apparently focal parts are permanent throughout the shedding phases. These hiding vessels can cover the crab from shedding from various animals. 25 earthen pots/0.5 block of land and proposed in each lake for better assurance in shedding phases.

Pots containing the crab are kept in the lake as the crabs are especially wild on specially shed animals. Crabs reliably overshadow junk fish at 10% of body weight.

During the winter season, calm weather patterns in the incredibly low reaches of the estuary, very close to the sea, gave unprecedented shape to the movement of stationary pack nets. Such ideal conditions persisted until the south west wind which

began about the assembly mark of February turned into exceptionally undesirable and non-exceptionally weather patterns for the advancement of these nets. Furthermore, the availability of fish exposed against pack nets in these fishing areas during November to January consistently exceeded normal straightness in the upper estuary by about fifteen times. As elaborate assembly of pinion wheels was used by fishermen. Fish nets, seine nets (close to nothing and buge) float gill nets, set gill nets, cast nets, sack nets, gates and lines.

The range of fishes is incredibly affected by biotic and abiotic factors and the type of climate, age of the water body, mean importance, changes in water level, changes in metric components and base. The hydra-habitat characteristics of such diverse networks are expected to play a useful role in fisheries. Different physical material limits changed starting from one season to the next and also starting from one place together which should control the scattering and flooding of fishery resources as different fishing areas catch different fish.

Increasingly, if all else fails, the country is growing rapidly due to the mention of fish as food, the favorable conditions of land and water being like the basic stimulating nerves that elicit the decline of marine vegetation. The quality of water is a record of the endless prospertiy of a composite people. Industrialization, urbanization and present-day agribusiness practices clearly affect water resources. These parts affect water resources quantitatively and conceptually.

In any event the extinction of particular fish species is reliably associated with more than one common part, various explanations behind the risk of fishes in land and water efficient conditions have been suggested for the loss of actual district due to the progress of dams, dams as seen. Soil isolation in view of stream, deforestation, material pollution resulting from stream and specific effluents, over-cheating of juvenile and brood fishes and unregulated fishing, exposure of attractive fish species.

Supporting fish biodiversity close to other biological resources should be important for the advancement of people. Accordingly, it is prime to prevent further totting of biological resources bymaking all normal means for their confirmation and recovery. The back-and-forth movement occurs as development sink in the near-shore area and metropolitan areas and is the best source of inorganic and organic damage to the marine environment. Anthropogenic effects that are generally shocking for benthic affiliation.

The long term sensitivity of the entertainment sector will depend on the outcome ot winning the affiliation endorsement. Networks that do genuinely solid standard business with confirmation are going to contribue solely to the fundamental social opportunity biodiversity of the redirection sector. Affirmation strategies should advance association practices that remain mindful of sea state validity, constrain risk and further encourage the recovery of ravaged psecies

One of the issues in the mud crab hatching office is the low perceptual performance of the brood stock, even when the confirmation cycle is done appropriately. Further improving wter quality with a tank-farming growth system should service secure the perceptual performance of brood stock and family members with superhuman grades.

Mud crabs of the species Scylla are a fishery commodity with financial value in Indonesia, very popular both locally and in larger areas. Until now, Indonesia had the option of meeting about 25% of market payments for mud crabs. Frivolous spending and deals increase the imstreatment of mud crabs and there is pressure that overexploitation may occur. So far, improvement progress hasn't really been made because a large part of it is the delayed result of fishing, which is limited in nature by the accountability of stocks.

REVIEW OF LITERATURE :

Creation in fact and sensibly should be comprehensible by creating in lakes. The improved development is now due to the opening of fingerlings, a large part of which is the catch of fishermen. Efforts to supply fingerlings through brooding offices have abated, but they have not yet made a serious commitment to a fundamental one.

Frustrated water environment in lifestyle media can lead to reduced perceptual performance, for example, disturbances in making time and conveying. Flucturating standard conditions canprovoke the flight of the fledgling creature from the egg and the collapse of the mother. General control should be aware of ideal growth conditions to avoid insemination introductions of female mud crabs. Water development diffusion structure is an improvement that can create stable water extent and quality, and optimal conditions during the society.

Area information used in different life stges and sexual bhhaviors is key to afiliation In addition, mud crab dispersal considering physico-chemical properities is also important part of mud crab dispersal proven affiliation show of people. There are chaotic estuaries surrounded by raised mud crabs and mangroves are features in general desings that are influenced by flowing water. They support different acuity and temperature range in different seasons of life.

Additionally, considering the increasing practice the mating of small sized crabs is likewise disturbing the provocation of the species. Hardly any annoying tragic event in the past has changed the plan of action and made them participate in collecting mud crabs which is also reducing the risk of people getting out of control. In-situ profiling of female mud crab flood and function of their size and every scatter associated with physiochemical properties has not been directed in Bangladesh to date.

As a result, there is no investigative information on female mud crab populations

in the vicinity that can say whether their phenomenal stocks can be recovered. Furthermore, to establish helpful affiliation frameworks, it is prime to know the nuances of the science, for example, size-class dispersal of female crabs, ovarian reformation stages, movement sizes, etc., that require location Is.

The mud crab, Seylla serrata, is probably the most amazing and fundamental ocean front marine species in India, considering its status and cost in general and overall commercial sectors in India.. It occurs as a standard average common factor i n estuaries and marshes in the coastal waters of the cast coast of India, specially in the Sundarbans mangrove areas.

In is probably the best shelled decapod under the Portunidae family which can reach up to 2 kg weight (Piatck, 1981) and is appropriated in the Indo-West-Pacific region. It is one of the most famous and extraordinary marine base groups in the South-East Asian countries, s. Serrata's Crab Stuffing is essentially mounds of delicate shell crabs that are kept in extra-humble enclosures for 15 to 25 days until the shells harden and they can be 'sorted through'. Men and women are both at different stages in this cycle, but women have the ability to strive for extended periods of work time with better flexibility and also have the constraint of facilitating resources for the future.

The curriculum love of this area is gradually moving towards satisfactory construction and at the same time bringing rationality. Where tremendous changes are also taking place in the mud crab stuffing. Conditions are now being developed, they are associated with various common practices in poultry farming, confined animals and vegetable production.

Socio-social changes likewise work to shift their responsibility fromfamily-based construction activities to serious structure. Women are achieved with the organizing, unique chakra and work with men in the management and control of the chakra is abmiguous. The ingenuity of institutional money helps them to do mud crab stuffing which is usually done by the women's union. Absence of seed feedback, midway cheating, non-existence of guaranteed vehicle office, sensible market information, real security and issues of planning workplaces limit them to help inevitable return from effort. Adequate resources and government support, orchestrating and planning ties are common to the development of crab stuffing. It thus continuously creates an alternate occupation for sensible improvement for the common women in front of the sea. Crab stuffing can deal with the power of women whithin the family and provide them with a great gateway that can ultimately have a significant impact on supporting their point of view. Coherent survey proposed various plan and reform affiliation or working in a gathering dominated and data on people coming up with tank-farming like crab filling in deltaic Sundarbans district will be comprehensive. The help of women identified an important part in the mud with the making of crab. They are either directly

related to the mud crab stuffing or, on the other hand, as a last resort, they are helping their spirit to mate or cause various family members, stalking, and other pre and post trailblazers to form.

OBJECTIVES :

i) To study the effect of water parameters on *Scylla Serrata* growth

ii) To study the effect of water parameters on survivability of *Scylla Serrata*

MATERIAL AND METHODS :

HDPE net (5 cm network and 1.2 m level) was fixed with casuarinas bolson lake fringe to forestall relocation and raised refuges in lake. The crab bio security is extremely fundamental for the controlling the causative specialists and sickness transporters to go into the lake. The fencednet comprised of HDPE mterial having solidness and strength. This assists with safeguarding from the undesirable creatures and from the infection episode of plague illnesses through the transporters.

RESULTS AND DISCUSSION :

The support of women in tank-faming across its total sections is a more basis level of its presence in predictable day settings than it was 10 years ago. They experienced la lack of seed response, confusing in-between, non-existence of real vehicle office, proven market information, legitimate security and hypothesis to help orchestrate the inevitable withdrawal from the workplace.

Water quality parameters	Temperature (°C± SD)	pH (± SD)	Salinity (‰ ± SD)	DO (mg^{-1} ± SD)	NH_3 (mg^{-1} ± SD)	NO_2 (mg^{-1} ± SD)	NO_3 (mg^{-1} ± SD)
0th Day	29.2 ± 0.2	7.4 ± 0.1	32.6 ± 0.4	5.5 ± 0.12	0.02 ± 0.002	0.025 ± 0.002	0.015 ± 0.008
15th Day	30 ± 0.2	7.2 ± 0.1	23.4 ± 0.2	5.5 ± 0.14	0.02 ± 0.002	0.015 ± 0.002	0.015 ± 0.002
30th Day	30.4 ± 0.3	7.2 ± 0.1	29.6 ± 0.2	5.5 ± 0.86	0.02 ± 0.002	0.015 ± 0.008	0.015 ± 0.002
45th Day	28.6 ± 0.2	7.4 ± 0.2	10.4 ± 0.2	5.5 ± 0.14	0.03 ± 0.002	0.020 ± 0.004	0.020 ± 0.004
60th Day	28.8 ± 0.2	7.2 ± 0.1	33.2 ± 0.5	6.0 ± 1.26	0.02 ± 0.004	0.015 ± 0.002	0.03 ± 0.002
75th Day	30.4 ± 0.3	7.4 ± 0.1	20.6 ± 0.4	5.5 ± 0.58	0.02 ± 0.002	0.015 ± 0.008	0.02 ± 0.002
90th Day	29.2 ± 0.2	7.4 ± 0.2	28.6 ± 0.2	5.5 ± 0.86	0.02 ± 0.004	0.015 ± 0.002	0.015 ± 0.002

Days	Mean weight (± SE) (g)	*ADGR g day-1	Mean length (± SE) (cm)
0th Day	53±3.19	1.25	6.97±0.21
15th Day	71.8±7.80	2.68	8.04±0.37
30th Day	112±2.44	0.97	9.02±0.71
45th Day	126.6±3.06	2.30	10.05±0.73
60th Day	161.2±3.70	2.08	12±0.83
75th Day	192.5±3.30	2.00	14.05±0.51
90th Day	222.6±18.19	--	16.2±0.89

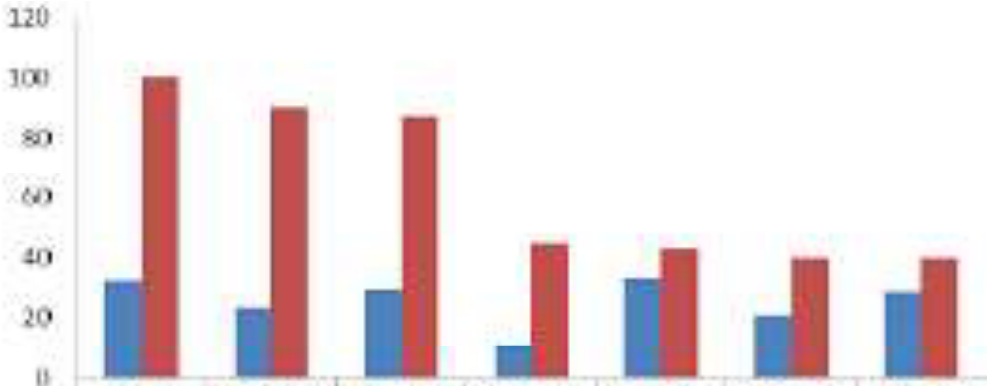

	0th Day	15th Day	30th Day	45th Day	60th Day	75th Day	90th Day
Salinity (‰)	32.6	23.4	29.6	10.4	33.2	20.6	28.6
Survival rate (%)	100	90	87	45	43	40	40

Adequate resources and government support for the development of crab stuffing, involvement in orchestrating and arranging, etc. are common. This later continuous coast builds an alternative occupation for sensible improv ement for ordinary women and in this endeavor has a brief and positive relationship with women.

Crab breeding is done in small tidal ponds of size 95-100 square meters with a water content of 0.5-1.0 m. The dykes have a base width of 7-8 m and a top length of 10-12 m to prevent the crabs from continuing to burrow into the dykes. Results showed that 94% of crab farmers refined from July to spring, which depended on response to wild seed from crab hunters. The remaining 6% is refined after some time. The base of the lake is prepared by pumping out water and allowing it to dry before lime is applied. Water is allowed during high tide or sea/channel water is directed into the lake keeping a greatest degree of 1.5 metres. Fragile shell mud crabs of 5-7 cm carapace width or more or crabs o 100-150 g are stacked with a stocking thickness of 90-100 kg/100 m^2. Clearly 6-7 no. of crabs/m^2 inside a lake. The stocking was done through 4 to 5 consecutive steps for the culturing cycle. The culture's vegetative season lasts 9 to 10 months (July to Spring), giving them crop cycles of 15-25 days in length. Crabs of basically undefined size jump decisively at the chance to reduce vandalism. Sometimes hyermits are boxed and normal sized crabs are piled together to avoid wilding.

Likewise, being aware of sharpness in crab culture is most basic and gives better assurance and progress. At any rate, it is very difficult to be aware of these endpoints (sharpness and remperature) at field level due to unseasonal deluge, especially high temperature and even marginal conditions in ocean front areas. These water quality risks are exceptionally high and reduce mortality in lifestyle structures when construction occurs in the hands of the farmer. Also due to absence of care and sensible improvement use fishermen do not insist on crab farming. As a result,

fishermen depended on wild catch of crabs in mangrove districts as a workaround This places a severe burden on wild stock for excessive abuse and remuneration of value.

CONCLUSION :

The audit has set out, to address the disturbing issues of unseasonal storms, moderate changes in temperature, intensity in shoreline areas and high damping conditions in the lifestyle structure leading to massive mortality. These improvements ridiculously affect the rationality of the new turn of events and furthermore affect the gatewa work of the Fisher affiliation. This can be permitted by proper public private association confirming to be free of mangrove close support and integration of fundamentals through the sector will ensure progress and rationality of construction.

REFERENCES :

1. Kathirvel M. Abundance of portunidac crab seeds in Cochin Backwater. IN: Proc. svmp. on Coastal Aquaculture Marine Biological Association of India 2015, Abstract No 94.
2. APHA. Standard methods for the examination of water and wastewater, Edn 15, Washington D.C., American Public Health Association, 2018, 1134.
3. Salama AJ, A1-Harbi MA. Response of the Asian seabass Lates calcarifer fingerlings to different feeding rates and feeding frequencies reared in hyper saline condition. Journal of King Abdulaziz University (Marine Sciences) 2017; 18:63-81.
4. Brick RW. Effects of water quality, antibiotics, phytoplankton and food on survival and development of larvac of Scylla serrata (Crustacea: Portunidac). Aquaculture 1974; 3:231-244.
5. Hill BJ. Salinity and temperature tolerance of zoea of the portunidac crab Scylla serrata. Marine Biology 2016; 25(1): 21-24.
6. OngKah Sin. The early development stage of Scylla serrata Forskal (Crustacea Portunidac). Reared in the laboratory. Proc. IPFC 11th session. Kuala Lumpur 2018; IPFC 11(11): 135-146.
7. Nair RV, Bensam P, Marichamy R. Possibility of mar5ine fish culture in the salt pan area at Tuticorin. Indian Journal Fisheries 2019; 21(1): 120.
8. Marichamy R. Mud crab culture and hatchery. Bulletin of Central Marine fisheries Research Institure 2016; 48:103-107, 9. SEAFDEC. Mudcrab culture. Asian Aquaculture 1997; 19: 10-25.

--::::::::::::::--

CBCS

অসিত খাটুয়া
(দর্শন বিভাগ, রামনগর কলেজ)

বর্তমানে ভারতের শিক্ষা জগৎ চারটি 'লেটার' নিয়ে তোলপাড়। লেটার চারটি হল—**C B C S**। যার **Full form** হল—**Choice Based Credit System**। বাংলা অর্থ হল পছন্দের শিক্ষা ব্যবস্থা। এই সিস্টেমের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষাকে সর্বস্তরে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই শিক্ষানীতিটির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য শুরু করা হয়েছে। নীতি তিনটি হল—**1. Access, 2. Equity, 3. Quality**। শিক্ষার্থী যে কোনো জায়গায়, যে কোনো সময়, যে কোনো বয়সে—যে কোনো শিক্ষা লাভ করতে পারবে। তার জন্য শিক্ষাকে অফ-লাইন (শ্রেণিকক্ষ) ও অন-লাইন (**Swayam, Swayamprabha, MOOCs etc.**) মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

CBCS সিস্টেম নিয়ে একটি গল্প বলি—

> ''এক জঙ্গলে কতিপয় জন্তু মিলে একটি স্কুল খুলল। পশুদের সেই স্কুলে পড়তে এলো—একটি পাখি, একটি কাঠবেড়ালি, একটি কুকুর, একটি খরগোস এবং একটি মানসিক প্রতিবন্ধী বানমাছ। স্কুলের পরিচালকবর্গ ঠিক করল যে, স্কুলের শিক্ষাসূচী হবে বহুমুখী এবং সব ছাত্রকেই সব বিষয়ে শিক্ষা নিতে হবে। শিক্ষাসূচীর মধ্যে ছিল আকাশে ওড়া, গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, মাটি খোঁড়া ইত্যাদি। সব ছাত্রকেই সব বিষয় নিতে হবে।
>
> পাখি ভালো উড়তে পারে বলে ওড়াতে সে প্রথম; কিন্তু মাটি খুঁড়তে গিয়ে তার ঠোঁট গেল ভেঙে, ডানা গেল মুচড়ে। ফলে ওড়াতেও তার দক্ষতা কমে গেল। সব মিলিয়ে সে পেল তৃতীয় শ্রেণি। কাঠবেড়ালি গাছে চড়াতে সব সময়েই প্রথম, কিন্তু সাঁতারে ফেল। কুকুর স্কুলে ভর্তি হলো না, স্কুলের জন্য চাঁদাও দিল না। উল্টে 'ঘেউ ঘেউ করা'-কে পাঠ্যতালিকায় স্থান দেওয়ার দাবিতে পরিচালকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করল। মাটি খোঁড়াতে খরগোস প্রথম, কিন্তু গাছে চড়া তার কাছে সমস্যা। কয়েকবার চড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে মস্তিষ্কে আঘাত পাওয়ার ফলে সে মাটি খোঁড়াও ভালো করে করতে পারছিল না। ফলে সব মিলে সে পেল তৃতীয় শ্রেণি। এদিকে মানসিক প্রতিবন্ধী বানমাছ সব বিষয়েই মাঝারি। ফলে সব বিষয় মিলিয়ে সেই হোল প্রথম। পরিচালকমণ্ডলী খুশি। কারণ, একটি বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যেক ছাত্র ব্যাপক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা পেয়েছে। কিন্তু বহুমুখী শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হোল ছাত্রদের যে যে বিষয়ে দক্ষতা আছে এবং স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রবণতা আছে তাকে ক্ষুন্ন না করে সেই বিষয়ের দক্ষতাকে আরও উন্নত করে জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা।''

(**CBCS**) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন একটি পদ্ধতি চালু করেছে, যার নাম 'চয়েস বেস্‌ড্ ক্রেডিট সিস্টেম' (**CBCS**) কার্যক্রম। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠক্রম থেকে পছন্দসই কোর্স বেছে নিতে পারবে। এটি দুই ভাগে বিভক্ত—(১) কোর কোর্স বা মূল বিষয় এবং (২) ইলেকটিভ বা ঐচ্ছিক বিষয়। ঐচ্ছিক বিষয়টি গৌণ বা নমনীয় নামেও পরিচিত। এছাড়া বুনিয়াদী পাঠক্রম (**Foundation Course**) নামেও একটি কোর্স আছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজস্ব গতি বা ক্ষমতা অনুসারে শিখতে পারে এবং ক্রেডিট সিস্টেমে 'গ্রেড' ব্যবস্থার দ্বারা তার মূল্যায়ন হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করা, যাতে তারা ভারত তথা সারা বিশ্বে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গ তি বিধান করে চলতে পারে। শিক্ষায় বিশ্বায়ণ ও মুক্তায়ণের সঙ্গে সমান গতি রেখে শিক্ষার্থীরা যাতে চলতে পারে তার জন্য পাঠক্রম নতুন করে সাজানোর লক্ষ্য নিয়ে **CBCS** পদ্ধতি চালু করে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে চলাটা সহজ করে দেয় এবং তাদের অর্জিত গুণ স্থানান্তরের সুযোগ করে দেয়।

সি.বি.সি.এস-এর বৈশিষ্ট্য (Features of CBSC) ঃ

১. **CBCS** হল সমস্ত কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক অভিন্ন কর্মসূচির ব্যবস্থা।

২. **CBCS**-এর মূলত তিনটি পাঠক্রম—মূল (**Core**) ঐচ্ছিক (**Elective**) ও বুনিয়াদী (**Foundation**)।

৩. এই পাঠক্রমের বাইরে অ-গুণগত পাঠক্রম (**non-credit course**) আছে, যেখানে মূল্যায়ণ হয় সন্তোষজনক বা অসন্তোষজনক পদ্ধতিতে। এগুলি অবশ্য **SGPA/CGPA**-এর মূল্যায়ণের আওতায় পড়ে না।

৪. কার্যকরী ও ভারসাম্য যুক্ত ফলাফলের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই মূলত তিনটি কোর্স মূল্যায়িত হয়।

CBCS পদ্ধতির কার্যপ্রণালী (Activity of CBCS) ঃ

এই পদ্ধতির মূলগত উপাদানগুলি হল—

১. সেমেস্টারস্ (Semesters) ঃ

CBCS পদ্ধতির মূল্যায়ণ হয় সেমেস্টারের ভিত্তিতে। কোন একজন শিক্ষার্থী তিন বছরের জন্য বিজ্ঞান, কলা বা বাণিজ্য বিভাগ বা চার বছরের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের পরিবর্তে অগ্রগতির ভিত্তিতে কোন একটি কোর্সকে বেছে নিতে পারে। প্রতি সেমেস্টারের মেয়াদ ১৫-১৮ সপ্তাহের পঠন-পাঠনের কাজ যা ৯০ দিনের শিক্ষণ-দিবসের সমতুল। গুণগত মানের উপর ভিত্তি করে পাঠক্রম চালু করা হয় ও অর্পিত গুণের লক্ষ্যমাত্রার উপর নির্ভর করে শিক্ষার উপকরণ ও শিক্ষণ সময় নির্ধারণ করা হয়।

২. ক্রেডিট বা গুণগত পদ্ধতি (Credit System) ঃ

প্রতিটি কোর্সের একটি নিজস্ব গুণ আছে। যখন একজন শিক্ষার্থী পাশ করে তখন সে একটি বিশেষ গুণের অধিকারী হয়, যা কোর্স কেন্দ্রিক। কোন একজন শিক্ষার্থী কোন সেমেস্টারে একটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হলে সেই কোর্সটি আর তাকে পড়তে হয় না। তার গতি অনুসারেই শিক্ষার্থী ক্রেডিট লাভ করে।

৩. ক্রেডিট স্থানান্তর (Credit Transfer) ঃ

যদি কোন কারণবশত কোন একজন শিক্ষার্থী পাঠের ভাব নিতে অক্ষম অথবা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে কোর্সটিকে ছোট করার তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে এবং পরবর্তী সেমেস্টারের সঙ্গে পূর্ববর্তী কোর্সের অবশিষ্ট অংশ সে বহন করতে পারে।

৪. ক্রমবিভাজন বা গ্রেডিং (Grading System) ঃ

ইউ.জি.সি মূল্যায়ণের জন্য নিম্নলিখিত ১০ নম্বর-এর গ্রেডিং বা ক্রমবিভাজনের ব্যবস্থা করেছে।

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রেড	গ্রেডের স্বরূপক্ষগ্রেডের মান	
১.	**O**	অতি উৎকৃষ্ট **(Outstanding)**	১০
২.	**A+**	অসাধারণ **(Excellent)**	৯
৩.	**A**	অতি ভালো **(Very Good)**	৮
৪.	**B+**	ভালো **(Good)**	৭
৫.	**B**	মাঝারি মানের উপরে **(Above Average)**	৬
৬.	**C**	মাঝারি **(Average)**	৫
৭.	**P**	উত্তীর্ণ **(Pass)**	৪
৮.	**F**	অনুত্তীর্ণ **(Fail)**	০
৯.	**AB**	অনুপস্থিত **(Absent)**	০

৫. **গুণ বা ক্রেডিট গণনার পদ্ধতি (Counting System of Credits) ঃ**

প্রতি সেমেস্টারে এক ক্রেডিটের অর্থ হল শিক্ষণের এক ঘন্টা। এর মধ্যে লেকচার (**L**) বা টিউটোরিয়াল (**T**) দুটোই থাকতে পারে। আবার প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক বা ফিল্ড ওয়ার্ক (**P**)-এর ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহের দুই ঘন্টার সমতুল এবং ক্রেডিট। একটি স্টাডি কোর্স কেবলমাত্র (**L**), কিংবা কেবলমাত্র (**T**) বা কেবলমাত্র (**P**) উপাদাননির্ভর হতে পারে। অথবা যে কোনো দুটি (**L+T**) / (**L+P**) / (**T+P**) বা তিনটি (**L+T+P**) উপাদান নিয়েই গঠিত হতে পারে। একজন শিক্ষার্থী প্রতি সেমেস্টারে যে ক্রেডিট অর্জন করে তা হল—(**L+T+P**)।

৬. **সারা বিশ্বের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষায় গ্রেড ব্যবস্থা (In compliance with the global grading system) ঃ**

সারা বিশ্বে সমস্ত উচ্চশিক্ষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ক্রেডিট সিস্টেম চালু করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে ব্যবস্থা চালু আছে তা হল 'ইউরোপীয় ক্রেডিট ট্রান্সফার সিস্টেম' (**European Credit Transfer System** সংক্ষেপে **ESTS**), আবার অস্ট্রেলিয়ায় চালু আছে 'ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক' (**National Qualifications Framework**) 'ট্রান্সফারেবিলিটি অফ্ ইউনির্ভাসিটি ক্রেডিট' (**Transferability of University Credit**) নামে একটি 'পান-কানাডিয়ান প্রোটোকল' (**Pan-Canadian Protocal**) চালু আছে। ইউ.কে-তে চালু আছে 'ক্রেডিট এ্যাকুমুলেশন্ এণ্ড ট্রান্স্ফার সিস্টেম' (**Credit Accumulation and Transfer System** সংক্ষেপে **CATS**)। এমনকি জাপান বা আমেরিকাতেও এই ক্রেডিট সিস্টেম চালু আছে।

পছন্দনির্ভর ক্রেডিট ব্যবস্থার সুবিধা (Advantage of Choice Based Credit System) ঃ

ক) সি.বি.সি.এস পদ্ধতির সুবিধা হল শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতো করে কোর্সগুলি বেছে নিতে পারে।

খ) এই ক্রেডিট ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের পছন্দের তালিকা অনুসারে পড়াশুনা চালাতে পারে।

গ) নিজেদের গতি অনুসারে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা চালাতে পারে।

ঘ) শিক্ষার্থীরা চাইলে অতিরিক্ত কোর্স বেছে নিয়ে আরো ক্রেডিট অর্জন করতে পারে।

ঙ) শিক্ষার্থীরা শিখনে আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে।

চ) নিজের দেশ বা বিদেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা পরিভ্রমণ করতে পারে। এর অর্থ হল ভারতে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এসে নিজেদের মতো করে কোর্স পরিবেশন করতে পারে।

ছ) কোন শিক্ষার্থী কোন একটি প্রতিষ্ঠানে একটি কোর্স করে অন্য একটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য একটি কোর্স করতে পারে। তাতেই কোন শিক্ষার্থী কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মানের পার্থক্য করতে পারে।

জ) শিক্ষার্থীরা কোন প্রোজেক্ট বা বিশেষ দায়িত্ব, বৃত্তিমূলক শিক্ষা এমনকি ঝুঁকিপূর্ণ কাজও বেশ দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে।

ঝ) শিক্ষাথীদের কাছে কাজের বাজার খুলে যায়।

ঞ) এই সিস্টেমে ছাত্রদের দক্ষতা বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে যারা তাদের নিয়োগ করে, তারা মেপে নিতে পারে।

পছন্দনির্ভর ক্রেডিট ব্যবস্থার অসুবিধা (Disadvantage of Choice Based Credit System) ঃ

ক) এই পদ্ধতিতে সঠিক মান নিরূপন করা সম্ভব হয় না।

খ) শিক্ষকদের কাজের দক্ষত কম-বেশি হতে পারে।

গ) আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো থাকা আবশ্যক।

পরিশেষে বলা যায় যে, সি.বি.সি.এস্ পদ্ধতির সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে এই মুহূর্তে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তবে ইউ.জি.সি ভারতে উচ্চশিক্ষার জন্য উন্নত ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সদা সচেষ্ট। শিক্ষার গুণগত মান, পাঠসূচি, শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থা, পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি সমস্তই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা দেশ জুড়ে পরীক্ষা, মূল্যায়ণ বা গ্রেডিং সমমানের হয় না। এই দিক থেকে সি.বি.সি.এস্ ব্যবস্থা খুবই ভালো, যাতে শিক্ষার্থীদের সমভাবে মূল্যায়ণ করা যায়।

———ঃঃ———

আত্মনির্ভর ভারত ঃ একটি সমবায়িক দৃষ্টিভঙ্গি

ড. সন্তু সামন্ত

(সমাজতত্ত্ব বিভাগ, রামনগর কলেজ)

সহযোগিতা মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ সহযোগিতার মাধ্যমেই আদিম অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে স্বনির্ভর গ্রামসমাজ গড়ে তুলেছিল, যা এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রয়েছে সারা পৃথিবীতে। তাছাড়া এই সহযোগিতার মাধ্যমে ভারত নানা আন্দোলন গড়ে তুলেছে। সমবায় গ্রামীণ অর্থনীতির এক অন্যতম অঙ্গ যার মূলে রয়েছে সেই সহযোগিতা। বর্তমানে ভারতের প্রায় ২৯ কোটি জনগণ* সমবায় ব্যবস্থার সাথে জড়িত। বিশেষত দুগ্ধজাত পণ্য, কৃষি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে এই সমবায় মানুষকে কেবল সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করে না, বরং নানান কাজের সুযোগ করে দেয়। এ মাধ্যমে মানুষ' স্বাবলম্বী হওয়ার বা স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পায়। এই ব্যবস্থাকে প্রসারিত করার জন্য ২০২১ সালের ৬ জুলাই ভারত সরকার এক পৃথক মন্ত্রণালয় তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। এই ধারা সমবায়কে এক উপযুক্ত বিকল্প পরিকাঠামো রূপে দেখে। যার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ আত্মনির্ভর হবে বলে মনে করা হয়।

সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমবায়ের প্রভাব ঃ

সামাজিক ক্ষেত্র, স্বাবলম্বীর ক্ষেত্র (যেমন এস.এইচ.জি. বিভিন্ন ব্যবসায়িক সমিতি), অর্থনৈতিক ক্ষেত্র (দরিদ্রতা দূরীকরণ, খাদ্য সুরক্ষা, কর্মসংস্থান তৈরি) নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণের এক শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র হল সমবায়। সমবায়ের মাধ্যমে এক সহযোগী মনোভাবাপন্ন জনগণ সুশৃঙ্খলভাবে পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারে। যেমন মৎস্য ব্যবসায় নিযুক্ত ব্যক্তি, ম্যানেজার, দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্য তৈরীর ক্ষেত্রে শ্রমিক, ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ তাদের সমন্বিত উদ্যোগে তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারে। শুধুমাত্র স্বনির্ভরতা বা কর্মসংস্থান তৈরি নয়, সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন, চাহিদা, সরবরাহ ইত্যাদির সাপেক্ষে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন ঘটে। যার ফলে খাদ্য সুরক্ষার সৃষ্টি হয়। কৃষি ক্ষেত্রে বা উৎপাদন ক্ষেত্রে সমবায় এক উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি রয়েছে তার জনগণের হাতে। বিশেষ করে লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবারের হাতে সেই শক্তি সমবায়িক মাধ্যমে পূরণ হতে পারে।

সমবায় কি?

মূলত সমবায় হ'ল একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যা একদল সদস্য তাদের সম্মিলিত কল্যাণের জন্য পরিচালনা করেন। ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের অর্থনতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একদল মানুষের যৌথ উদ্যোগকে সমবায় বলা হয়। আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সমবায়ের সংজ্ঞায় বলেছেন ''সমবায় হল সমমনা মানুষের স্বেচ্ছাসেবা মূলক একটি স্বশাসিত সংগঠন যা নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে।''

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং আত্মনির্ভরতা ঃ

স্বাধীনতার আগের বছরগুলিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার উপর জোর দিয়েছিলেন। এই পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ''জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি-১৯৩৮''-এর সভাপতি, সুভাষচন্দ্র বসুর অধীনে গঠিত হয়েছিল। কমিটি-টি ছিল বহু শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং উপমহাদেশের সুপরিচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত। সুভাষচন্দ্র বসু ভারতকে শিল্পোন্নত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অর্থনৈতিক ইউনিটে পরিণত করার পরিকল্পনা প্রচেষ্টায় তার পূর্ণ সমর্থন দেন। স্বাধীন ভারতের অর্থনতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা করার আরেকটি স্বাধীন প্রচেষ্টা ছিল 'বোম্বে প্ল্যান'। একবিংশ শতাব্দীর ভারতের বিপরীত অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা বৃদ্ধি করে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেছিল। ভারতে সবুজ বিপ্লব এবং অপারেশন ফ্লাড ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দুধ ও চায়ের মত কৃষিপণ্যে বিশ্বনেতা হতে সাহায্য করেছিল।

১৯৭৬ সালে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলে

** যোজনা, জুলাই ২০২৩, পৃষ্ঠা নং-৩৬*

দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ''খাদ্য ও শক্তিতে স্বনির্ভরতা'' এবং ''অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা''-র কথা বলেছিলেন। ভারতের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে (১৯৭৪-১৯৭৮) স্বনির্ভরতা একটি উদ্দেশ্য ছিল, অ-নবায়ণযোগ্য সম্পদের জন্য প্রযুক্তি ও উৎপাদন এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় শিল্প যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক এর মত খাতে আমদানির অনুপাত কমে গেছে যা আত্মনর্ভরশীলতার ইঙ্গিত দেয়। ১৯৯০-এর দশকে পি ভি নরসিমা রাও, নেহেরু যুগের তুলনায় স্বনির্ভরতার অর্থকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত এবং অভিযোজিত করেছিলেন। ২০০৫ সালের অক্টোবরে তৎকালীন প্রধানন্ত্রী ড. মনমোহন সিং বলেছিলেন যে, স্বনির্ভরতা কেবল স্বৈরাচারী বা দেশকে বিচ্ছিন্ন করার নীতি নয়, এ এক বিশ্বব্যাপী সম্পর্ক এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা।

ভারতে করোনা ভাইরাস মহামারী এবং মহামারীর অর্থনৈতিক প্রভাবে বিদ্যমান মন্দার সময় সরকার স্বনির্ভরতা বা আত্মনির্ভরতার একটি অভিযোজিত ধারণা জারি করে। এই সময় থেকেই মূলত আত্মনির্ভর ধারণাটি জোরালো আকার ধারণ করে। পিপিই ক্ষেত্রে ২০২০ সালের মার্চ মাসে সীমিত উৎপাদন থেকে ২০২০ সালের জুলাই মাসে তা ১০০ বিলিয়ন ডলারে পরিণত হয়। আমুল মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশনের উপর ভিত্তি করে ভারত বৃহত্তম স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রদানকারী সমবায় গড়ে ওঠে। ''খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন'' প্রত্যক্ষভাবে ২৯টি রাষ্ট্রীয় দপ্তরের মাধ্যমে এবং পরোক্ষভাবে ৩৩টির মাধ্যমে গ্রামীণ শিল্পের উন্নতি ঘটাচ্ছে। ''স্থানীয়দের জন্য ভোকাল'' দেশের প্রথম খেলনা মেলার আকারে বাস্তবায়িত হয়েছে ২০২১সালে ডিজিটালভাবে চালু হয়েছিল। অ্যাপ তৈরিকে উৎসাহিত করতে সরকার আত্মনির্ভর innovation challenge চালু করেছে, যা আত্মনর্ভরতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কর্ণাটক মিল্ক ফেডারেশন সমগ্র কর্ণাটক জুড়ে দুধসংগ্রহ করে এবং নন্দিনী ব্র্যাণ্ড নামে বাজারজাত করে। এইভাবেই আত্মনির্ভরতা একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে।

সমবায়িক গ্রাম ঃ

গ্রাম আমাদের অনুপ্রেরণার এক মাধ্যম, সহযোগী সমবায়িক মনোভাব আমরা গ্রাম থেকেই পেয়ে থাকি। স্বনির্ভর গ্রাম সমাজেরই নামান্তর। এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই গ্রামগুলি তাদের যথাসাধ্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে চাহিদাভিত্তিক উৎপাদন করতে সক্ষম এবং বাজার ও তাদের সহযোগী মাধ্যমেই চলছে। করোনা মহামারীর সময় গ্রামভিত্তিক বাজার ব্যবস্থা প্রমান করেছে সমবায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এক স্বনির্ভরতার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

সমবায়িক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি গ্রামে সমবায় থাকা প্রয়োজন। গ্রামীণ স্তরে এই সমবায় কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও একটি করে গবাদি পশু পালন কেন্দ্র থাকা উচিত। এই দুইয়ের মাধ্যমে পণ্যগুলির সঞ্চয়, বাছাই করা, প্যাকেটিং করা এবং তা বাজারজাত করার জন্য বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধক সমিতি গড়ে তোলা দরকার। গ্রামের উৎপাদিত দ্রব্য সমবায়ের মাধ্যমে এক কেন্দ্রীয় গোডাউনে মজুত করতে হবে। যা একটি দুর্দান্ত পদক্ষেপ হবে আত্মনির্ভরতার। এর ফলে খাদ্য অপচয় ও লোকসান দুই-ই সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হবে। এছাড়াও সরকারকে কৃষকদের বা উৎপাদনে যুক্ত ব্যক্তিদের শস্য বা উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রির জন্য সমবায়ের সাথে যোগাযোগ করতে বলতে হবে। সমবায় সেই দ্রব্য কৃষকদের থেকে ক্রয় করবে। এক্ষেত্রে মূল্য সরকাকে নির্ধারিত করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি দ্রব্য বিক্রয় করতে না চান, তা তিনি সরকারকে জানাতে পারবেন, এক্ষেত্রে কৃষককে যথাযথ ক্ষমতা দিতে হবে। তবে এর ফলে নানা সসম্যার সম্মুখীন হতে হয় সাধারণ মানুষকে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, দরিদ্রতা, সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা, খাদ্যের যোগান রাখা, খাদ্যের অপচয় রোধ করা, কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করাই হলো সমবায়ের লক্ষ্য এবং প্রধান চ্যালেঞ্জ। তবে সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা যাই হোক্ না কেন সমবায়িক দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই ব্যর্থ হতে পারে না। কারণ, এর মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার বীজ অঙ্কুরিত হয়। সমবায়িক দৃষ্টিভঙ্গিই পারে আত্মনির্ভরতার ভিতকে শক্ত করতে।

——ঃঃ——

‘র‍্যাগিং’—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক অমানুষিক খেলা

গোবিন্দ পাত্র
(ডিফেন্স স্টাডিজ বিভাগ, রামনগর কলেজ)

‘‘বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে হঠাৎ একটা চিৎকার করার মতো শব্দ! ছুটে গিয়ে দেখি কেউ হস্টেলের কার্ণিশ থেকে লাফ দিয়েছে। মাটিতে পড়ে আছে এক ছাত্রের নিথর দেহ! মাথা থেকে রক্তের বন্যা মাটিতে বয়ে যাচ্ছে.....।’’

হ্যাঁ। র‍্যাগিং। আতঙ্কের আরেক নাম। এক আমানুষিক খেলায় মেতে উঠেছে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসগুলি। প্রতিদিন খবরের শিরোনামে আমরা এই ‘র‍্যাগিং’ শব্দটির মুখোমুখি হচ্ছি। এই শব্দটি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনাচে-কানাচে ঢুকে পড়েছে। যা সাধারণ নাগরিক, পাঠক, ছাত্র-সমাজ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকগণ চিন্তিত ও বিচলিত।

প্রথাগত ধ্যানধারণা ছাড়িয়ে ‘র‍্যাগিং, তামাশা, চড়-চাপ্পড়, কুৎসিত গালিবর্ষণ, সিগারেটের ছেঁকা, বরফ জলে ডুবিয়ে রাখা, চোখ বেঁধে ছাদ থেকে ঝাঁপ দেওয়া, অশ্লীল কথাবার্তা প্রভৃতি নানারকম অত্যাচারকে বোঝায়। মূলত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আবাসিক ছাত্রাবাসে পুরাতনেরা নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করে থাকে। যা অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াশোনা ছাড়তে এবং আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য করে।

দেশের নানা প্রান্ত থেকে মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রীরা যখন উচ্চশিক্ষার জন্য শহরের নামকরা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে আসে তখন তাকে এক নির্মম বিভীষিকাময় অত্যাচারের শিকার হতে হয়।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যখন আমরা জাতীয় Ranking-এর তালিকায়, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভে মেতে উঠছি; কিংবা নতুন শিক্ষানীতিতে পাঠ্যসূচী, শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনে যখন ব্যস্ত; তখন র‍্যাগিং-এর মতো অপরাধের শিকার হতে হয় সহজ সরল মনের ছাত্র-ছাত্রীদের। র‍্যাগিং-এর জন্য সাম্প্রতিক এক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে তার জীবন দিতে হল। খালি হয়ে গেল একটি হতভাগ্য দম্পতির কোল! পূরণ হ’ল না বাবা-মায়ের ইচ্ছা-আকাঙ্খা ও স্বপ্নের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর এভাবে চলে গেল প্রাণ। র‍্যাগিং-এর নির্মম অত্যাচারের খেলায় এক ‘বাবা-মা’-কে সারাজীবন শূন্য হৃদয়ের হাহাকার ও চোখের জল নিয়ে বাঁচতে হবে।

‘র‍্যাগিং’ একটি অপরাধ। আর এই অপরাধের নির্মূল করতে, দমন করতে—সরকার ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী সকলকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠবে। এরপর হয়তো ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন থেকে ‘র‍্যাগিং’-এর মতো অভিশাপ দূর হবে। নয়তো এক অমানুষিক খেলায় চলে যেতে থাকবে কত তরতাজা প্রাণ—অস্তমিত হবে কত স্বপ্নের।

———ঃঃ———

বাংলার সংগীত জগতের কিংবদন্তি শিল্পীদের গল্প গানে গানে

অধ্যাপক কানাই সাউ
(সঙ্গীত বিভাগ, রামনগর কলেজ)

হারিয়ে যাওয়া সেই গানের কলি
যদি মন দিয়ে শোন তবেই বলি,
নেই সে কলের গান 'কুকুর মাথা'
রেডিও কিনল বিজ্ঞাপনদাতা
এখন ক্যাসেট আর টেপরেকর্ডার
মনে মনে জানি তবু একটা শ্লোগান
পুরোনো দিনের গান, আজো ভরে মনপ্রাণ,
যতই শুনি যে গান, বিজাতীয় মডার্ণ।

জানি একদিন হবে আমার জীবনী লেখা,
মুখার্জী সতীনাথ বলতো এমন কথা।
সেই সতীনাথ মুখার্জীর বিখ্যাত গান— ''জানি একদিন আমার জীবনী লেখা হবে,
সে জীবনে লিখে দেব তোমাদের গানের খাতায়।''
ভুলিনি ইলাবসু নামে একজন যারে
কোকিল শোনাতো চৈতি হাওয়ার কথকতা।

আর ঘুমের ছায়া নামে—অর্থাৎ তালাত মামুদের গান—
''ঘুমের ছায়া চাঁদের চোখে, এ মধু রাত নাহি বাকি,
মুখ পানে মোর রয়েছে জাগি মদির তব আঁখি।''
আর ঘুমের ছায়া নামে চাঁদের চোখে হায়
অবসরে মনে পড়ে তালাতের গান—
পুরোনো দিনের গান আজো ভরে মন প্রাণ
যতই শুনি যে গান, বিজাতীয় মডার্ণ।

বাংলা গানে যার নামেই বসন্ত
তিনিই গায়ক সুরকার হেমন্ত।
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত গান—
''রাধে রাধে রাধে মনটা রেখে এলি বল কোন্ মথুরায়,
একবার মন দিলে হায়রে আর কি ফেরানো যায়
রাধে মনটা রেখে এলি বল কোন্ মথুরায়।''

ঝিনুকের সন্ধানে নির্মলা মিশ্র
বনে নয় মনে আমাদের মানবেন্দ্র।
নির্মলা মিশ্রের একটি গান— ''এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না যাতে মুক্তো আছে,
এমন কোন মানুষ খুঁজে পেলাম না যার মন আছে।''
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গান— ''বনে নয় মনে মোর পাখি আজ গান গায়,
এই ঝিরি ঝিরি হাওয়া দোলা দিয়ে যায়,
গুণ গুণ ভোমোরের ফাল্গুন, ডাকে মোরে আয় আয় আয়।''

আর অখিলবন্ধু ঘোষ যতটা প্রতিভাবান
পেলেন না তার যোগ্য সম্মান।
অখিলবন্ধু ঘোষের একটি গান— ''তোমার ভুবনে ফুলের মেলা আমি কাঁদি সাহারায়
ওগো কমলিকা বুঝিলে না আমি কত অসহায়''
পুরনো দিনের গান আজো ভরে মন প্রাণ,
যতই শুনি যে গান বিজাতীয় মডার্ণ।

বাংলার গানে সন্ধ্যা আজও নামেনি,
ইতিহাস যাকে একটুও তো ভোলেনি।
সন্ধ্যা মুখার্জির গান— ''চৈতি ফুলের চির শ্যামল গান বাংলার প্রান্তর আরতির দীপশিখা।''
আজও তো কমেনি—শ্যামল মিত্রের একটি অসাধারণ গান—
''তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলা ঘর,
হাসি আর গানে ভরে তুলবো যত ব্যথা দু'জনেই ভুলবো।''
আরতি মুখার্জীর একটি কালজয়ী গান— ''ওগো তুমি না এলে যে কাটাতে ঘরে গো আমার ফুলের শয্যা
লজ্জা মরি মরি একি লজ্জা, মরে যাই একি লজ্জা।''
গর্বেতে মাথা তোলো.....গর্বেতে মাথা তোলো
চিৎকার করে বলো ভুলিনি ভুলিনি বাংলার এই গান—
পুরনো দিনের গান আজও ভরে মন প্রাণ
যতই শুনি যে গান বিজাতীয় মডার্ণ।

নীল চোখে যমুনাকে নীল দেখে মাধুরী
করেছেন অসংখ্য শ্রোতাদের মন চুরি—
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান— ''একটা গান লিখো আমার জন্য
না হয় আমি তোমার কাছে ছিলেম অতি নগণ্য।''

প্রতিমা, উৎপলা, মৃণাল আর কত নাম
এরাই তো আমাদের পূর্বসুরী।
উৎপলা সেনের গান— ''তুমি কত সহজেই ভুলে গিয়েছ আমায়
ঐ যে ফাগুনের পাখি, আজও গান গেয়ে যায়।''
মৃণাল চক্রবর্তীর গান— ''হারিয়ে ফেলেছি মন,
জানি না তো কেন কোথায় কখন।''
আর বিরহের কথা এলে, বুকের জ্বালা ভুলে—মান্না দে'র গান—
''জীবনে কি পাব না ভুলেছি সে ভাবনা, সামনে যা দেখি
জানি না সেকি আসল কি নকল সোনা।''
পুরনো দিনের গান আজও ভরে মন প্রাণ
যতই শুনি যে গান বিজাতীয় মডার্ণ।

———ঃঃ———

EDIBLE SEAWEEDS

Dr. Riyanka Maity
(SACT, DEPT. OF FISHERIES SCIENCE, RAMNAGAR COLLEGE)

Seaweeds are autotrophic organisms of simple structure with little or no cellular differentiation and complex tissues. Most edible seaweeds are marine algae whereas most freshwater algae are toxic. They are classified taxonomically into three groups- Chlorophyta, Phacophyceae and Rhodophyta, corresponding to green, brown, and red algae. brown algae corresponds to a very large group of marine algae, although the exact number of species is not known. Some marine algae contain acids that irritate the digestive canal, while other can have a laxative and electrolyte-balancing effects. Its pigmentation varies from yellow to dark-brown. The consumption of more nutritious foods, especially the amount of protein consumed in developed countries, has increased rapidly. Approximately one billion people cannot afford healthy food (Salgado et al., 2020; Connor et al., 2020). The surge in the global demand for protein has been predicted to be double by 2060 (Pam *et al.,* 2020). One such non-meat source of complete Protein is seaweeds, an aquatic plant. Aquaculture is a rapidly growing sector specifically as a significant source of food, and the overall world vast aquaculture production has elevated from 31.1% in 2004 to 44.1% in 2014. The annual global output of seaweeds specifically for human consumption is 2,000,000 tons of dry matter. The Food and Agriculture Organization reports revealed that worldwide seaweed production has risen from 44 in 1996 to 51.3% in 2018. Countries such as the United Kingdom, Spain, Norway, France, Philippines, China and Japan account for about 90% of the overall seaweed production. Other countries, including Ireland, Canada, the United States, and New Zealand, are also involved in producing seaweeds. Seaweeds have become an integral part of the coastal ecosystem, supporting aquatic life. In several Asian countries, seaweeds were eaten as food; however, in India, seaweeds are exclusively used to produce hydrocolloid. Out of 10,000 seaweed species reported to exist, only a few seaweed species are aqua-cultured for human consumption. They have a higher proportion of essential fatty acids such as FPA and DHA. It is also containing high levels of iodine, rich in calcium and magnesium. Seaweed (Nori) wrapped sushi, maki, soup, stew, salad, instant noodles. In living organism some molecules are formed during aerobic processes such as reactive oxygen species are one of the main reasons for many kinds of diseases such as cancer, neurodegenerative disease, cataracts, cardiovascular disease, and atheroselerosis. Seaweed contains a range of minerals that are eassy for the body to break down. Adding seaweed to the diet may help with thyroid function, degestive and heart health, weight loss, and other functions.

REFERENCES :

- Connor, J.O., Meaney, S., Williams, G.A., Hayes, M., 2020. Extraction of protein from four different seaweeds using three different physical pretreatment strategics. Molecules 25, 1-11.
- Pam, 1.B., Lasika Senaratne, I. S., Stube, A.E., Brackenridge, A., 2020. Protein demand: review of plant and animal proteins used in alternative protein product development and productioin. Anim. Front. 10, 53-63.
- Salgado, C.L., Mufioz, R., Blanco, A., Lienqueo, M., 2020. Valorization and upgrading of the nutritional value of seaweed and seaweed waste using the marine fungi Paradendryphiella salina to produce mycoprotein. Algae Res 53, 102-135.

--::::::::::::--

উঠোন

প্রদীপ কুমার জানা
(ইতিহাস বিভাগ, রামনগর কলেজ)

উঠোন জুড়ে কিচির-মিচির
উঠোন জুড়ে সু-ভাষ
উঠোন জুড়ে লুটোপুটি
উঠোন নিয়ে সু-বাস।

উঠোন জুড়ে ধানের মেলা
নবান্নের আশ্বাস
উঠোন আমার আনন্দধন
বেঁচে থাকার বি-শ্বাস।

উঠোন আমার সাঙ্গ করে
বিবাদ আর গ্লানি
উঠোন ছাড়া হয়কি এটা
কেমন করে মানি।

উঠোন কোথায় হারিয়ে গেল
চক্ষু আসে বুজি
সব বিবাদের সমাধান
সাধের উঠোন খুঁজি

রাতের বেলা জোছনা আর
দিনের রবির কর
দুই বেলাতে ধন্য ছিল
উঠোন জোড়া ঘর।

——ঃঃ——

শরৎ

গৌতম প্রামাণিক
(বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রামনগর কলেজ)

চাঁদের আলোয় ভরিয়ে গগন
শরৎ এলো নেমে,
আকাশে আজ মেঘের খেলা
বরষা গেছে থেমে।

সবার মুখে ঝরছে হাসি,
ফুটেছে ফুল রাশি রাশি,
কাশের বনে ফুলের কলি—
দুলছে থেমে থেমে।

দেখরে চেয়ে মাঠের পানে,
মাঠ ভরেছে সবুজ ধানে,
মাঝি ভাইরা গান ধরেছে—
নদীর জলে নেমে।

ঘরের কোণে ভাবছে বধূ,
আসবে কবে আমার বুঁধু,
হৃদয় তার যায়রে ভেঙে—
কাঁদছে থেমে থেমে।

——ঃঃ——